কর্ত্তা-ভজন ধর্ম্মের আদি বৃত্তান্ত

বা

সহজতত্ত্ব প্রকাশ।

(তৃতীয় সংস্করণ।)

এবার উত্তমরূপ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তীত
এবং পরিবর্দ্ধিত হইল।

শ্রীমনুলাল মিশ্র কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩২ সাল।

মিত্র—প্রেস, ৪৫নং গ্রে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান্না দ্বারা মুদ্রিত

মুখবন্ধ।

বঙ্গাব্দ ৮৯২ সালে আবির্ভাব এবং ৯৪০ সালে নীলাচলে তিনি অন্তর্ধান করেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং আসামে ব্যাপক ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিলেও তাঁহার তিরোধানের পর হইতেই সে ধর্ম্মের মধ্যে কেমন একটা অবসাদ দেখা দেয়। শতাধিক বৎসরের মধ্যে উহা নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্বীকার না করিলেও বর্ত্তমানের কর্ত্তা-ভজন পদ্ধতি যে চৈতন্য মহাপ্রভুর মহধর্ম্মের অন্যতম শাখা তাহা আজকাল অনেককেই স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। সন ১১৬০ সাল বাঙ্গালার ধর্ম্মেতিহাসের অন্ধকূপ হত্যা একটী স্মরণীয় শুভ বৎসর। এই সনেই বর্ত্তমান কর্ত্তা-ভজন ধর্ম্মের উদ্ভব হয়। চৈতন্যদেব নীলাচলে সহসা আত্মগোপন করিবার ১৬১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১১০১ সালে আমরা আউলচাঁদের আবির্ভাব দেখিতে পাই। অনেকেরই ধারণা এই ফকির আউলচাঁদই নদীয়ার সেই গোরাচাঁদ—রূপান্তর—ধরিয়া ধরায় নব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন কারতে উদয় হইয়াছিলেন। ১১৭৬ সালে পুনরায় তিনি অন্তর্ধান করেন। ঘোষপাড়া নিবাসী রামশরণ পালের সহিত মিলিত হন, এই রামশরণ আদি পুরুষ।

আউলচাঁদ ১১৭৬ সালে অন্তর্ধান করেন, আর ১১৮২ সালে শ্রীশ্রীদুলালচাঁদ রামশরণের ঔরসে ও সতীমা'র গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। দুলালচাঁদই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ত্তা-ভজন ধর্ম্মের

প্রচারক। এই মতের ভক্তগণের জন্য শ্রীশ্রীভাবের গীত নামক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন, এই মহাভাবযুক্ত ভাবের গীতের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবে উপদেশ দিয়াছেন।

১১৮২ সালে ৫৭ বৎসর বয়সে যখন তিনি ভৌতিক দেহ রক্ষা করেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মমত বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, আমরা এক্ষণে যথাসাধ্য সামঞ্জস্য করিয়া সার সংগ্রহ পূর্ব্বক ভক্ত সমাজে কর্ত্তা-ভজন সত্য ধর্ম্মের আদি বৃত্তান্ত একখানি ধারাবাহিক আদি কথা প্রচার করিলাম। আশা করি ইহার সাহার্য্যে ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণে এতদ্ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। প্রথম সংস্করণের সময় বহু গোলযোগের জন্য সকল বিষয় সঠিক দিতে পারি নাই, এক্ষণে তৃতীয় সংস্করণে সেই সকল বিষয় দিয়া আদি বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ হইল, দ্বিতীয় সংস্করণে হয় নাই।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে যে সকল ভুল ছিল, এবার তৃতীয় সংস্করণে সে গুলি যথাসাধ্য সংশোধিত হইল। এবং সঠিক সকল দেওয়া গেল।

এক্ষণে ভক্তসুধিগণের নিকট প্রার্থনা এই যে যদি ইহার কোন স্থানে কোন প্রকার ভ্রম বা ত্রুটি দেখেন, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যানাইলে বারান্তরে তাহা সংশোধিত করিয়া দিব।

সন ১৩৩২ সাল
৮ই ফাল্গুন,

বিনীত—
শ্রীমনুলাল মিশ্র।

কর্ত্তা-ভজন সত্যধর্ম্মের

আদি বৃত্তান্ত।

প্রথম পল্লব।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নদীয়াধামে অবতীর্ণ হইবার কিছুকাল পরে সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। শোকাতুরা জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত জগদানন্দকে নদীয়ায় প্রেরণ করিতেন। পণ্ডিতপ্রবর প্রতিবৎসর নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভুর কুশলাদি জ্ঞাপন পূর্ব্বক অদ্বৈতাদি অন্যান্য বৈষ্ণবপ্রধানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন।

মহাপ্রভুর নবদ্বীপ পরিত্যাগের অব্যবহিত কাল পর হইতেই বৈষ্ণব সমাজে নানা অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে বৈষ্ণব-চূড়ামণি অদ্বৈত হৃদয়ে বড়ই ব্যাথা পান। একদা জগদানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে মহাজ্ঞানী অদ্বৈত একটী প্রহেলিকা রচনা করিয়া পণ্ডিতপ্রবরের মারফৎ মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করেন।

জগদানন্দ যথাকালে নীলাচলে মহাপ্রভুর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু তখন বকুলকুঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন। অপরাপর কুশলপ্রশ্নাদির আদান-প্রদানের পর জগদানন্দ অদ্বৈত-প্রেরিত প্রহেলিকাটী পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন।

সহসা মহাপ্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সেই প্রহেলিকা-পত্রে যাহাই থাকুক, তৎশ্রবণে তিনি বিমনা হইয়া পড়িলেন। আচম্বিতে খণ্ড মেঘে শশধর আবৃত হইলে তাহার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ যেমন পরিম্লান পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ তাঁহার মুখকমলেও মুহূর্ত্তের জন্য বিষাদের ছায়া গাঢ়াঙ্কিত করিয়া মলিন করিয়া তুলিল। অদ্বৈত-রচিত সেই প্রহেলিকাটী নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল ঃ—

"বাউলকে কহিও লোক হইবে আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কালে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

অদ্বৈতাচার্য্যের প্রহেলিকার অর্থ মহাপ্রভু হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করিবার মানস করিলেন। তিনি কিঞ্চিৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর প্রধান প্রধান ভক্তকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—আজ টোটায় গোপীনাথ জীউর মন্দিরে সংকীর্ত্তন হইবে। তখন সকলে মহোল্লাসে প্রভুর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপীনাথ জীউর মন্দিরাভিমুখে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে গোপীনাথ জীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গাহিতে গাহিতে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ উপস্থিত হইল। ভক্তমণ্ডলী সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। প্রভু ভাবের আবেশে অস্ফুটস্বরে তিন বার কি বলিলেন। কেহই তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিল না। অবশেষে সম্বিৎ পাইয়া তিনি হরিবোল হরিবোল বলিয়া উঠিয়া বসিলেন।

সে দিন আর সংকীর্ত্তন হইল না, তখন যথারীতি ভোগরাগাদি সম্পন্ন হইবার পর, প্রভুর সেবাদি ক্রিয়াও সম্পন্ন হইল। তিনি মন্দিরাভ্যন্তরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও প্রসাদ পাইয়া প্রশান্তমনে বাহিরে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

সেই দিন মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে গোপীনাথ-মন্দিরে আত্মগোপন করিলেন। তাঁহার অদর্শনে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহারা তাঁহার শোকে ম্রিয়মাণ এবং বিষাদে আচ্ছন্ন হইলেও, তাঁহার পুনঃ সন্দর্শনের আশা ত্যাগ করিল না। তাহারা অবিচলিত বিশ্বাসে তাঁহার পুনরাবির্ভাবের প্রত্যাশায় অটলহৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। যে সকল ভক্ত তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে, জগতের চক্ষে তাঁহার তিরোভাবে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অন্যত্র তাঁহার পুনরুদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল। তিনি ভক্তের প্রাণ এবং ভক্ত যে তাঁহার প্রাণ। ভক্ত ছাড়িয়া তিনি কি থাকিতে পারেন।

মহাপ্রভু দেখিলেন যে, তিনি সব করিলেন, কেবল সংসারী দিগের নিমিত্ত কোন ধর্ম্ম রাখিলেন না। অদ্বৈতের প্রহেলিকা শুনিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সংসারী সংসারে থাকিয়া কিসে সহজে ধর্ম্মের উপাসনা করিতে পারে তাহারই উপায় স্থির করিলেন। সংসারীর মধ্যে সত্যধর্ম্মের প্রচার করিবার জন্য নীলাচল হইতে গোপনে পলায়ন করিলেন। তাঁহার ভক্তগণ তখন তাঁহাকে হারাইলেন বটে পরে কিন্তু কেহ কেহ তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। যে ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে

পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নয়—মোট বাইশ জন মাত্র। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া ধন্য করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অদ্যাবধি নিত্য লীলা করে গৌররায়।
ভাগ্যবান যেই সেই দেখিবারে পায়॥
আদি-অন্ত বিচারিয়া বুঝ নিজ ভাবে।
চৈতন্যের নিরুপণ পাইবে স্বভাবে॥
শেষ লীলা চৈতন্যের অপ্রকট ভাব।
না পারে বুঝিতে কেহ তাঁর সে প্রভাব॥
নানা লীলা সম্বরিয়া মিশিলা মানুষে।
কেহ বলে পাষাণে মিশিলা অবশেষে॥
না পারে বুঝিতে কেহ চৈতন্য চরিত্র।
যে বুঝে সে মতে হয় তাহাতে উন্মত্ত॥
মানুষে পাষাণে কভু মিলন না হয়।
সহজে সহজ মানুষ হইলেন উদয়॥
সেই বস্তু স্থায়ী হয় ভাবুক হৃদয়ে।
যাহার যে ভাব ইহা বুঝ বিশ্বাসিয়ে॥

ঠাকুরের অনন্ত দয়া। সংসারী মানুষের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তাহারা সংসারে থাকিয়া সংসারের কাজ কর্ম্মের মধ্যেও সহজভাবে যাহাতে তাঁহাকে পাইতে পারে তাহার উপায় বিধান করিলেন। স্বল্পায়ু ক্ষীণবল কলির মানবের পক্ষে কঠোর ধর্ম্মাচরণ, যাগযজ্ঞ, ধ্যানধারণা সহজসাধ্য নয়, তাই অতি সহজে মানুষকে ভজনা করিয়াই,

সেই মানুষের মধ্যে তাঁহার সত্ত্বা অনুভব করিতে পারে, তাহা-রই সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অখণ্ড বিশ্বাস এবং পূর্ণপ্রীতির উপর ইহার ভিত্তি সংস্থাপিত। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। বিশ্বাস—আত্মপ্রত্যয়ই উন্নতির সোপান। মানুষকে বিশ্বাস করিতে পারিলে মানুষের মধ্যেই সেই মানবা-তীত মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মানুষে পাষাণে কভু মিলন হয় না—তাই তিনি ফকির বেশ ধরিয়া উদয় হইলেন।

পদব্রজে গঙ্গা পার।

মহাপ্রভু নীলাচলে ভক্তমণ্ডলীকে কাঁদাইয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে সহসা একদিন ত্রিবেণীর ঘাটে তাঁহার আবির্ভাব হইল। কিন্তু আজ আর বরাঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ নাই। সে গেরুয়া বসন, হাতের সে কমণ্ডলু কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছেন। আজ কন্থাধারী ফকিরের বেশ! সে অপূর্ব্ব বেশ দেখিয়া লোকে মুগ্ধনেত্রে ভাবিতেছিল কে এ ফকির?

ফকির যখন ত্রিবেণীর ঘাটে উপস্থিত, তখন ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল। প্রবল ঝড়ে তীরের বৃক্ষলতা আন্দোলিত এবং গঙ্গাবক্ষস্থিত বারিরাশি সংক্ষুব্ধ হইয়া তটভূমিতে আসিয়া সশব্দে পতিত হইতেছিল। সে দুর্য্যোগে কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না—পারাপার হওয়া ত দূরের কথা। ফকির সেই ভীষণ দুর্য্যোগে গঙ্গা পার হইবার জন্য ঘাটে অবতরণ করিলেন। সফেন তরঙ্গরাশি সশব্দে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার

পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার চরণ স্পর্শমাত্র ক্রুদ্ধ ভাগীরথী শান্তভাব ধারণ করিলেন—বক্ষের তরঙ্গবিভঙ্গ যেন কোন যাদুমন্ত্রে মন্দীভূত হইয়া আসিল—ঝড় বৃষ্টি থামিল, ফকিরের হুকুমে গঙ্গার জল তখনি শুকাইয়া গেল। ফকির পদব্রজে গঙ্গা পার হইয়া পরপারে উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার আসিয়া গঙ্গা পূর্ণ হইয়া গেল। ঘাটের অনতিদূরে মাত্র একখানি নৌকা বাঁধা ছিল। সেই নৌকার ভিতর বসিয়া শঙ্কর নামক পাটনী এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল; এ ফকিরত সাধারণ ফকির নয়। যাঁহার আবির্ভাবে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল—ভাগীরথী শান্তমূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার জলরাশি সংবৃত করিয়া লইল—সে ত সামান্য ফকির নয়! এ হেন অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষকে চর্ম্মচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া পাটনী আপনাকে ভাগ্যবান ভাবিতে লাগিল। তাহার মোহ দূর হইবা মাত্র উঠিয়া আক্ষেপ করিয়া কহিল— "হায় কি করিলাম, পেয়ে নিধি হারাইলাম।" পাটনী নৌকা খুলিয়া গঙ্গার অপর পারে উপস্থিত হইল এবং নৌকা একস্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া ফকিরকে ধরিবার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিল। কাঁচড়াপাড়ার মধ্যবর্ত্তী বাঘের খালের সমীপ-বর্ত্তী হইয়া দেখিল ফকির খাল পার হইয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়া-ছেন। আর তাঁহাকে ধরিবার উপায় নাই দেখিয়া বিফল-মনোরথ ক্ষুব্ধ পাটনী তাহার নৌকায় ফিরিয়া আসিল।

দ্বিতীয় পল্লব।

রামশরণ পাল।

আজ পূর্ণিমা তিথি। জগতের অন্ধকার নাশের জন্য আজ সংসার-গগনে এক অকলঙ্ক চাঁদের উদয় হইবে, তাই ধরার মানব আনন্দে অধীর হইয়া সেই পূর্ণচন্দ্রমার প্রতীক্ষা করিতেছে।

রামশরণ পাল প্রত্যহই প্রত্যুষে উঠিয়া তাহার ক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া থাকেন। আজও অভ্যাসমত তাঁহার ক্ষেত্রে আসিয়াছেন, এমন সময়ে এক ফকির আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ফকিরের তপ্তকাঞ্চনাভ দেহ এবং তাঁহার অপূর্ব্ব বেশ দেখিয়া পাল মহাশয় মোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

ফকির উত্তর করিলেন,—গঙ্গাপার নিত্য-পাড়া হইতে আসিতেছি।

পাল মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দেশে কি মনে করিয়া আসা হইয়াছে?

ফকির ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, আমার বেটুয়ার মধ্যে সত্যরত্ন আছে, এ দেশে গ্রাহকের অনুসন্ধানে আসিয়াছি। এ সত্যরত্ন চিনিয়া লইতে পারিবে কি?

রামশরণ পাল উত্তরে কহিল, যদি দয়া করিয়া চেনাও তবে চিনিতে পারিব।

ফকির কহিল, চেনাবার জন্যই এখানে আসিয়াছি, তুমি কি আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আগে আসিয়া কি সকলই ভুলিয়াছ?

রামশরণ পাল অতি নিরীহ সাদাসিদে লোক। কোনরূপ ঘোর প্যাঁচের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। বিদ্যায় বল, বুদ্ধিতে বল, সংসারধর্ম্মে বল, লৌকিক আহার ব্যবহার আদান প্রদান সকল কার্য্যেই স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া সংসার করিতেন। সাহেব-সুবা দেখিলে ঘরে গিয়া খিল দিতেন—রাজা মহারাজার লোক আসিলে স্ত্রীকে আগাইয়া দিতেন—সেই রামশরণ ফকিরের কথা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া উত্তর করিলেন—তুমি বেটুয়ার মধ্যে রত্ন আনিয়াছ, এ দেশে গ্রাহক পাইলে দিবে।

ফকির কহিল, হাঁ, এ দেশে গ্রাহক পাইলে সত্যরত্ন তাহাকে দিব।

পাল মহাশয় উদাসভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ফকির বলিলেন,—কি ভাবিতেছ ?

পাল মহাশয় বলিলেন,—তোমার সত্যরত্নের গ্রাহকের জন্য ভাবিতেছি।

ফাকর তাঁহাকে লইয়া গ্রামের প্রান্তভাগে এক নির্জ্জনস্থানে উপস্থিত হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব থাকিবার পর ফকির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রাহক খুঁজিয়া পাইলে কি ?

পাল মহাশয় তখন ভাবিতে বসিলেন। কত কি ভাবিলেন, কত মানুষের কথা মনে পড়িল কিন্তু ফকিরের রত্ন নমুনার গ্রাহক কে হইবে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাঁহার স্মৃতিমন্দিরের

কোন স্থানে দেখিতে পাইলেন না। শেষে ঐ কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সংসার ভুলিলেন, সহধর্ম্মিণী ভুলিলেন, নিজের ক্ষেত ক্ষামার গরু বাছুর ভুলিলেন, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিলেন। সমাধিমগ্ন যোগীর মত সব ভুলিয়া ঐ একমাত্র ভাবনার অতল জলে ডুবিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, তাইত কে রত্ন লইবে ?

কিছুতে মনে পড়িল না। ভাবিতে ভাবিতে দিবা অবসান হইল—সন্ধ্যা আসিল, রাত্রি হইল। তবু ভাবনার অবসান নাই। মাথার উপর নক্ষত্রখচিত অনন্ত গগন—নিম্নে জ্যোৎস্না প্লাবিত নীরব প্রকৃতি। নির্জ্জন প্রান্তরে নীশিথে এখনও তেমনই চিন্তামগ্ন। শেষে সর্ব্বশরীর অবসান হইল, তথাপি পাল মহাশয় অন্বেষণ করিয়া পাইলেন না এর গ্রাহক কোথা আছে।

এদিকে পাল মহাশয়ের বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়াছে। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল পাল মহাশয় বাড়ীতে ফিরিয়া না যাওয়ায় তাঁহার সাধ্বী পত্নী ক্রমেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন অতীত এখনও তাঁহার দেখা নাই। অনুসন্ধানে লোক বাহির হইল ; অপরাহ্ন-সায়াহ্নও যখন চলিয়া গেল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—স্বয়ং বাহির হইলেন, গ্রামের কোথাও কেহ তাঁহার কোন সংবাদ বলিতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রনয়নে অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্ব গগনে ঊষার অরুণরাগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই পতিব্রতা পুনরায় পতির সন্ধানে বাহির হইলেন এবং গ্রামের নানাস্থান

অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন— "কে তুমি মা ?"

সাধ্বী সাশ্রুনয়ন মার্জ্জন করিতে করিতে নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহার স্বামী কাল হইতে বাড়ী না যাওয়ায় কি নিদারুণ উদ্বেগ এবং কষ্টের মধ্যে তাঁহার দিন-যামিনী অতিবাহিত হইয়াছে বিবৃত করিলেন।

স্ত্রীকে দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া পাল মহাশয় বড়ই ব্যথিত হইলেন। কহিলেন,—"ফকির সত্যরত্ন আনিয়াছে, তাহা কে লইবে তাহাই ভাবিতেছি। বাড়ীর কথা আমার মনেই ছিল না।"

তাঁহার কথা শুনিয়া পত্নী বিরক্ত হইলেন! রাগভরে কহিলেন, "তা থাকিবে কেন! কত কালের ভাবনা ভাবিতেছ? বলিয়া আসিলেই ত পারিতে। গরুবাছুর খাবার অভাবে মরিতেছে, তাহাদের দেখিবে কে? হাতে পয়সা নাই—ভুষি খইল কি দিয়া আসিবে?"

ফকির কহিলেন,—"মরিবে না মা তোমার গরুবাছুর মরিবে না। সব যোগাড় করিয়া রাখিয়াছি। ঐ গাছের গোড়ায় পাতা চাপা টাকা আছে—লইয়া যাও।"

পাল মহাশয়ের একবার সাক্ষাৎ পাইলে তাহাকে খুব ভৎসনা করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পালগৃহিণী বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলেন! কিন্তু তাঁহার স্বামীকে নিশ্চিন্তমনে নির্জ্জনে এক অপরিচিত ফকিরের সম্মুখে বসিয়া থাকিতে

দেখিয়া এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার নির্ব্বিকার ভাব লক্ষ্য করিয়া সব ভুলিয়া গেলেন। তাহার পর ফকিরের মুখে বৃক্ষমূলে টাকার কথা শুনিয়া, কি ভাবিয়া স্বামীকে আর সে সময়ে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন না।

নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া শুষ্ক পত্ররাশি সরাইতে বিস্তর মোহর বাহির হইল। দরিদ্রের কথা দূরে থাক তদ্দর্শনে অনেক ধনীরও মোহ উপস্থিত হইত কিন্তু দরিদ্রা পাল-গৃহিণী মোহর দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত হইলেন না। তিনি সযত্নে মোহরগুলি বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া ফকিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং সেগুলি তাঁহার চরণতলে ঢালিয়া দিয়া কহিলেন,—"এই লও, তোমার মোহর লও! অর্থ দিয়া ভুলাইলে ভুলিব না। যদি দয়াই হইয়া থাকে—যাহা দিতে আসিয়াছ দাও। সোণার চাকতি দেখাইয়া মুগ্ধ করিতে পারিবে না। দরিদ্র বড়ভুক্ষু-ধনী তুমি, এমন খাদ্য দাও যাহা গরীবের রসনা কোন দিন আস্বদন করে নাই।"

ফকির তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। সাধ্বীও ফকিরকে আর কোন কথা না বলিয়া গৃহাভিমুখিনী হইতে উদ্যত হইলেন। স্বামীকেও সঙ্গে লইবার জন্য আর তাঁহার তেমন আগ্রহ দেখা গেল না।

ফকির উঠিয়া দাঁড়াইয়া রামশরণকে কহিলেন,—"ভাবিতেছ কি? ভয় নাই হারাইবে না। যাহা হৃদয়ে পাইয়াছ, তাহাত হৃদয়েই থাকিবে। অন্তর করিও না—অন্তরে রাখিও। তুমিও উহার সহিত বাড়ী যাও—এইখানেই আবার দেখা হইবে।"

রামশরণ উঠিয়া দাঁড়াইবা মাত্র ফকির তাঁহাকে "কর্ত্তাবাবা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। রামশরণ তখন ফকিরকে আলিঙ্গন করিবামাত্র দুই দেহ এক হইয়া গেল। দুইটী হৃদয়-যেন দুই মহাসমুদ্র পরস্পরকে গ্রাস করিল। গাছের গোড়ায় শক্তির সঞ্চার হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার দুই দেহ পৃথক হইল—পূর্ব্বভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। রামশরণ আজ ফকিরঠাকুরের কৃপায় কৃপাসিদ্ধ হইলেন।

কর্ত্তাবাবার সহিত মিলন করিতে।
এই সূত্রে আসিলেন, গঙ্গার পারেতে॥
অপূর্ব্ব ফকিররূপ ধরি দয়াময়।
মহামন্ত্র সত্য নাম দিল যে নিশ্চয়॥
নিত্য সত্য শুদ্ধ সত্ব সাকার হইল।
যোগীরা যে জ্যোতিঃ দেখে শ্রীঅঙ্গে মিশিল॥

তৃতীয় পল্লব।

রামশরণের পত্নীর নাম সতী। তিনি নামেও সতী, কাজেও সতী। ফকির যে সামান্য লোক নয় তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং স্বামীকে সে রকম দুর্ল্লভ সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন না। তাঁহাকে ফকিরের নিকট রাখিয়া কয়েক পদ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সহসা কি ভাবিয়া আর একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন। যে দৃশ্য তাঁহার নেত্রগোচর হইল তাহাতে যুগপৎ বিস্ময়-পুলক এবং ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ

হইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিলেন, ফকির বা তাঁহার স্বামীর পৃথক অস্তিত্ব নাই—আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইবা মাত্র দুই দেহ এক হইয়া গিয়াছে! আর তাঁহার যাওয়া হইল না—বৃক্ষতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখেন বিমুক্ত আলিঙ্গন দুই জন পরস্পরের দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান। সতী কহিলেন—"ঠাকুর! যদি দয়াই করিলেন—ভুলিবেন না। এমনই দয়া যেন চিরদিন থাকে।"

ফকির কথা কহিলেন না—একটু হাসিলেন। তখন রাম-শরণ পত্নীর সহিত গৃহে ফিরিলেন। ফকির অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

তাহার পর ফকিরের সহিত রামশরণের নিত্যই সাক্ষাৎ হইত। তাহার ফলে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দের ভাবটা দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। পাল মহাশয় দিবসের অধিকাংশ সময়ই তাঁহার নিকট পড়িয়া থাকেন—সংসারধর্ম্ম আর ভাল করিয়া দেখিতে পারেন না। ক্রমে সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। সংসারে চাল নাই—বাজারহাট করিবার লোক নাই—গরু-বাছুর না খাইতে পাইয়া মরিতেছে—ক্ষেত-খামারের তত্ত্বাবধান হইতেছে না—পাল মহাশয়ের ভ্রূক্ষেপ নাই—এ সব দেখিবার তাঁহার অবসর হয় না,—তিনি গ্রামের বাহিরে নির্জ্জন প্রান্তরে ফকিরের সঙ্গলাভে পরিতৃপ্ত হইবার জন্য চলিলেন।

সংসারের এইরূপ অবস্থা এবং তৎপ্রতি স্বামীর সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব দেখিয়া সতী দেবী ফকিরকে বাড়ী আনিবার

জন্য পাল মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে রাম-শরণও ফকিরকে বাড়ী আনিবার জন্য খুব ধরিয়া বসিলেন। ফকির কিছুতেই সম্মত হন না, অবশেষে পালমহাশয়ের একান্ত আগ্রহাতিশয্য দর্শনে বলিলেন,—"যাইতে পারি যদি কেহ জানিতে না পারে। যে দিন টের পাইবে বা লোক জানাজানি হইবে, সে দিন আমি কিন্তু আর থাকিব না।"

পাল মহাশয় তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে বাড়ী লইয়া আসিলেন। ফকির কহিলেন,—"আমি একটু নির্জ্জন স্থান চাই—অত গোলমালের ভিতর বাস করিতে পারিব না।"

তদনুসারে পাল মহাশয় ফকির ঠাকুরের জন্য একটী নির্জ্জন ফাঁকা স্থানে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। যমুনা দীঘির বায়ুকোণে একখানি পুরাতন বাড়ী এখনও সেই স্থানে অবস্থিত আছে। এখনও অনেকে সেই কুটীরে গড়াগড়ি দিয়া জীবন ধন্য মনে করেন!

ফকির সেই নির্জ্জন পর্ণকুটীরে দিবারাত্র ঊবু হইয়া বসিয়া থাকেন। কাহারও সহিত দেখা করেন না। সংসারের কার্য্যান্তে অবসর পাইলেই পাল মহাশয় ও তাঁহার পত্নী সতী দেবী তাঁহার নিকট অবস্থান করেন। ফকির সতীর পরিচর্য্যা ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—"বেটুয়ার মধ্যে যে রত্ন আনিয়াছি, তোমায় প্রদান করিলাম! ইহার নাম "সত্য রত্ন"। চারোক্ত যাজন সিদ্ধ বীজ তোমায় দান করিতেছি। এই দেবজনদুর্ল্লভ নাম ধরায় অমূল্য নিধি। বল্লভ বল্লভী সকলকেই এ দুর্ল্লভ নাম অর্পণ করিবে। একনিষ্ঠ হইয়া ভক্তিসহকারে ডাকিলেই উত্তর

পাইবে। জল, মাটী, মানুষ—এই তিনে বিশ্বাস থাকিলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হইবে। বিশ্বাসই মূলাধার। একমন হইয়া এই তিনে বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারিলে বিশ্বে তাহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকিবে না। দীন দুঃখী অতিথ ফকিরকে সেবা দিবে—ভুলিয়া কখনও সেবা অপরাধে অপরাধী হইবে না! ধন-রত্ন আপনি আসিবে—চেষ্টা করিতে হইবে না—যে যোগাইবার সেই যোগাইয়া দিবে। এই সকল কর্ত্তৃত্বভার তোমার উপরই অর্পণ করিলাম। এই ধর্ম্মের তুমি "মূলগুরু"। তোমাকে অবলম্বন করিয়াই ইহার শাখাপ্রশাখা জগতে বিস্তার লাভ করিবে। আদিপুরুষ কর্ত্তাবাবা নামে অভিহিত হইলেন। তোমার উপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রধানা। তোমার কথাতেই কাজ চলিবে। এখানে একটী হাট বসিবে, লক্ষ লক্ষ পাপী তাপী এখানে আসিয়া শীতল হইবে। গরল গরজ যে পর্য্যন্ত না থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই সত্য হইবে। সত্যই সার—সত্যই ধর্ম্ম—সদা সত্যের অনুসরণ করিবে। যতদিন সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে—ধর্ম্মও তোমাকে আশ্রয় দিবে—এ কথা যেন বিস্মৃত হইও না।"

এই ভাবে কিছুদিন যায়, ফকির কুটীরেই বাস করেন, লোকসমাজে বাহির হন না বা কাহারও সহিত মেলামেশা করেন না। তথাপি ক্রমে ক্রমে দু-দশটী সঙ্গী জুটিল। নিভৃতে লোকচক্ষুর অগোচরে ফুল ফুটিলে সন্ধান দিতে হয় না, মধু-লোভী অলি আপনি আসিয়া জুটিয়া যায়। এই কয়টী সঙ্গী বা সহচর লইয়া তাঁহারা রাত্রিযোগে ভজনে যোগ দেন। যদি

কোন দিন কোন সেবার আয়োজন হয় তাহা হইলে খুব গভীর রাত্রে পাকাদির পর সেবাকার্য্য নিষ্পন্ন হইলে পাত্রাবশিষ্ট যাহা থাকিত, গৃহতল খননপূর্ব্বক মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত করিয়া ফেলা হইত—পাছে লোক জানাজানি হয়, সাধারণে পাছে টের পায়।

এই ভাবে দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল, ফকির ঠাকুর ততই পাগলামী আরম্ভ কবিতে লাগিলেন। তাঁহার সে সকল ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া তিনি যে প্রকৃতিস্থ এ কথা সহজে লোকে বিশ্বাস করিতে পারিত না।

একদা পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা অন্নপূর্ণার সহিত ধনীরাম পালের বিবাহকালে বাড়ীর মধ্যে যখন স্ত্রী-আচার হইতেছিল, সেই সময়ে ফকির দিগম্বর হইয়া সেই স্ত্রীসমাজে উপস্থিত হইয়া আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। নিমন্ত্রিতা রমণীগণ ফকির ঠাকুরের বিষয় অবগত ছিলেন না। তাঁহারা অন্তঃপুরে এক উলঙ্গ উন্মাদকে দেখিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং এই ক্ষেপাকে বাহির করিয়া দিবার জন্য পাল মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পাল মহাশয় বাড়ীর মধ্যে আসিলে স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক নানাভাবে ভৎর্সিত হইয়া বহির্মুখ প্রকৃতির বশে মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই সকল পুরমহিলার সম্মুখেই ফকিরকে কহিলেন,—"ঠাকুর তুমি কি আমাকে সংসার করিতে দিবে না? তোমার একি ব্যবহার! উলঙ্গ কেন? তোমার কি বস্ত্র নাই? আর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই বা বিবস্ত্র হইয়া তুমি কেন?"

ঠাকুর কোন কথা কহিলেন না, ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। বিবাহের উৎসব শেষ হইলে একদিন আসিয়া বলিলেন,—"আমার উপর তোমরা বিরক্ত হইয়াছ। আমি চলিয়া যাইতে চহিয়াছিলাম, তোমরাই আমাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিলে, আরত আমার থাকা হয় না। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল—প্রকাশ হইলে আর থাকিব না। সেদিন বিবাহরাত্রে তাহা ভুলিয়াছ, আর ত আমার এখানে থাকা হয় না!"

পালমহাশয় তখন অন্তর্মুখী হইয়া দেখিলেন, তাঁহার অপরাধ হইয়াছে। ক্রুটী স্বীকার করিলেন—তাঁহার অনুতাপ জন্মিল। সে মলিন মুখের দিকে চাহিয়া ফকির ঠাকুর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিলেন না। সেইদিন হইতে ফকির পথে ঘাটে এক আধবার বাহির হইতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পর লোকসমাজে তাঁহাকে আর বিবস্ত্র দেখা যায় নাই।

ইহার কিছুদিন পরে এক ঘটনা ঘটিল। একদিন ফকির রাস্তায় একটী রাখাল ছেলের সঙ্গে হাডুডু খেলা করিতেছিলেন। ঠিক যেন বালক স্বভাব। খেলা করিতে করিতে কথায় কথায় তাহার সহিত ঝগড়া বাধিল। ফকির রাগ বরদাস্ত করিতে না পারিয়া তাহার গালে এক চড় মারিলেন। রাখাল সেই একটী আঘাতের ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল, এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল।

তখন পাল মহাশয় বাড়ীতে ছিলেন না। সতী মা সংবাদ পাইয়া আসিয়া ফকিরকে ভৎর্সনা করিলেন। ফকির কহিলেন, "তুমি আমায় তিরস্কার করিতেছ, তবে আমি এখানে কেমন

করিয়া থাকিব।” এই বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। সেখানে সে সময়ে অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন সতীমার ইঙ্গিতে ফকিরকে আটক করিয়া কহিল, “খুন করিয়া পলাইলে হইবে কেন? তোমাকে আমরা যাইতে দিব না।” ফকির কোন কথা কহিল না বা চলিয়া যাইবারও চেষ্টা করিল না, নিস্তব্ধভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পালমহাশয় অন্যত্র ছিলেন। একজন লোক গিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। এ দুঃসংবাদ এখন কেহ তাঁহাকে শুনায় নাই, তিনি কাহারও মুখে কোন কথা শুনিবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন,—“মরিয়াছে! না না খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গিয়াছে। ফকির তাহাকে মারে নাই। তোমরা উহাকে দোষী করিতেছ কেন?”

পল্লীর লোকেরা সে কথা বিশ্বাস করিল না, তাহারা ফকিরকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিল। পাল মহাশয় পুনরায় দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—ও আপনি পড়িয়া গিয়াছে।

পল্লীর অনেকে ফকিরকে মারিতে দেখিয়াছে, সুতরাং পাল মহাশয়ের কথা বিশ্বাস করিবে কেন! তাহারা ফকিরকে ধরিয়া ফাড়িদারের হাতে চালান দিবার পরামর্শ করিতে লাগিল।

এই সময়ে ফকির কহিলেন—“তুমি বলিতেছ ও পড়িয়া মরিয়াছে। ও মরিয়াছে কিন্তু দেখিয়াছ ও মরিয়াছে কি না?”

এই কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল। বলিল এইবার ঠাকুর পাগলামি জুড়িয়াছে। তাহারা বলিল আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও মরিয়াছে।

ফকির ঠাকুর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পুনরায় পাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসিলেন—"তুমি বলিতেছ ও মরিয়াছে কিন্তু চোখে দেখিয়াছ কি ও মরিয়াছে।"

তখন পাল মহাশয় বলিলেন—"তুমি বলিতেছ ও মরিয়াছে আমিও তাই বলিতেছি ও মরিয়াছে। তুমি যদি বল ও মরে নাই, তবে উহার সাধ্য কি যে ও মরে।"

এই কথায় সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। তাহারা বোধ হয় ভাবিতেছিল ক্ষেপার সঙ্গে থাকিয়া পাল মহাশয়ও ক্ষেপা হইলেন না কি। কোন সহজ লোকের মুখ দিয়া কি এমন কথা বাহির হয়?

পালমহাশয়ের সেই কথা শুনিয়া ফকির বলিলেন,—"মরে নাই—উহাকে উঠিতে বল। হাডুডু খেলিতে খেলিতে এ ধাষ্টাম কি ভাল।"

এই কথা শুনিয়া পাল মহাশয় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। যেখানে বালকের প্রাণশূন্য দেহ পড়িয়াছিল তথায় উপস্থিত হইয়া সজোরে সেই মড়ার উপর এক পদাঘাত করিলেন। সে পদাঘাতে মড়া যেন একটু নড়িয়া উঠিল। তদ্দর্শনে সেখানে যাহারা ছিল তাহাদের মধ্যে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

পাল মহাশয় পুনরায় তাহাকে আর একটা লাথি মারিয়া কহিলেন,—"ওঠ পাজি! কেবল দুষ্টামি। ফকির বলিতেছে

তুই মরিস নাই। তোর সাধ্য কি যে মরিস। লোকে বলিতেছে ফকির মারিয়াছে, উঠিয়া বল ফকির মারে নাই।”

সত্যই এবার বালক উঠিয়া বসিল। চোখ রগড়াইয়া কহিল —“ফকিরত মারে নাই। আমার ঘুম আসিয়াছিল খেলিতে খেলিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, ফকির চলিয়া গিয়াছে, তুমি তাহার জন্য কাঁদিতেছ। ঐ যে ফকির রহিয়াছে, তবে তুমি কাঁদিতেছ কেন?”

এইবার পাল মহাশয়ের আবরণ খসিল। আর তিনি আত্ম সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। লোকে বুঝিল পাল মহাশয় আত্মহারা হইয়াছেন। এতক্ষণ তিনি ক্রন্দন করিতে পারেন নাই, বালককে জীবিত দেখিয়া আর হৃদয়াবেগ ধারণ করিতে পারিলেন না।

সতী মা ফকির ঠাকুরকে কহিলেন,—“ঠাকুর তোমার মহিমা আমরা কি করিয়া বুঝিব! তুমি নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিলে।” এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কুষ্ঠ ব্যাধি আরোগ্য।

যাহারা স্বচক্ষে উক্ত অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিল তাহারা বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছিল। পাল মহাশয়ের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় তাহাদের মস্তক আপনিই নত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—“এতদিন আমরা জানিতাম না যে পাল মহাশয় সিদ্ধ পুরুষ এবং তাঁহার নিকট যে ফকির আসিয়াছে আমরা তাঁহাকে সাধারণ ফকির বলিয়াই

জানিতাম এবং অনেক সময়ে তাঁহাকে পাগল ভাবিতাম, এখন দেখিতেছি তিনি একজন মহাপুরুষ।"

ফকিরের চপেটাঘাতে বালকের মৃত্যু এবং পাল মহাশয়ের পদপ্রহারে তাহার শবে জীবন সঞ্চারের কথা অচিরাৎ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন নানা স্থান হইতে বহু লোক তাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিবার জন্য ঘোষপাড়া আসিতে লাগিল। আগুণ যখন ছাই চাপা থাকে তখন তাহার অস্তিত্ব এবং দাহিকা শক্তি লোক লোচনের অগোচরেই থাকে কিন্তু কোনরূপে তাহার ভস্মাবরণ একবার অপসারিত হইলে তখন আর তাহাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখা যায় না।

ঘোষপাড়ার সদানন্দ ঘোষ বহুদিন যাবৎ কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতেছিল। তাহার জীবনের কোন আশা ছিল না। গলিতকুষ্ঠে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। ক্ষতস্থান হইতে দিনরাত্র দুর্গন্ধ রক্ত পূঁয নির্গত হইতেছিল এবং স্থানে স্থানে মাংস খসিয়া পড়িতেছিল। আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত ঘৃণায় তাহার সমীপস্থ হইত না।

পাল মহাশয়ের আত্মপ্রকাশের পর গ্রামবাসী কয়েক জন পরামর্শ করিয়া একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিল। তাহারা কহিল —"গ্রামের সদানন্দ গলিত কুষ্ঠে জীবন্মৃত হইয়া কষ্ট পাইতেছে আপনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া দিন! যাহার চরণস্পর্শে ধরায় মরায় প্রাণ পায়, তাহার পক্ষে একটা

তাঁহারা এক রকম জোর করিয়াই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন—তাহার ফলে সন্তানও হইয়াছিল। কিছুকাল সংসার ধর্ম্ম করিবার পর তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয় এবং বিশ্বম্ভর নামক পুত্র সুরাপায়ী উচ্ছৃঙ্খল এবং ভগবানের প্রতি তাহার অনাস্থার ভাব দেখিয়া সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই একদিন সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করিলেন। সেই অবধি তাঁহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। আজ বিশ বৎসরের পর স্বগ্রামে আসিয়াছেন। আসিয়াই ফকির ঠাকুরের সহিত এই তাঁহার প্রথম দেখা।

ফকির ঠাকুর কহিলেন,—"কানাই আবার সংসার করিতে হইবে। এবার সংসার রাখিয়া ধর্ম্ম। সংসারে ধর্ম্ম না রাখিলে জীব অগ্রসর হইবে কিসে? যাহাতে জীব সহজে ভগবানকে পাইতে পারে এবার তাহাই করা চাই। জীব আধার লইয়া ব্যাস্ত হয়, আধেয়কে খুজিতে অবসর পায় না, তাই বর্ণশ্রেষ্ঠ, রূপে, গুণে, বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে, সন্ন্যাসে, অলৌকিক ধর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া ভাবে ভগবানকে ভালবাসিতেছি। তাই নদিয়ায় চাউল বিকায় নাই, খরিদ্দার মিলে নাই, তাই অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন, বাউলকে কহিও লোকে হইবে আউল। আর সে বেশে ধর্ম্ম স্থাপন হইবে না। সংসারে সংসারীর ধর্ম্ম চাই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম চলে না। সংসারে সংসারীর ধর্ম্ম না রাখিলে সংসারীর ধর্ম্ম লাভ হয় না। সংসারে সেই ধর্ম্মের সংস্থাপন করিবেন বলিয়াই ভগবান আত্মগোপন করিবার পূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে পুনরপি সংসারী করেন। সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ সংসার আশ্রম

সংসারী অসংসারী উভয়ের মিলন ক্ষেত্র। ভোগ এবং ত্যাগের সমন্বয় ভূমি। যুতের হইলেই সে সংসার ধর্ম্মের, অযুতের হইলেই ত্যাগের, ইহাই ভগবৎ ইচ্ছা। সন্ন্যাসেও বিঘ্ন আছে কিন্তু যুতের সংসার বিঘ্নবাধাহীন নিরপেক্ষ ধর্ম্ম লাভের প্রশস্ত ক্ষেত্র।"

কানাই বলিলেন,—"তোমার জন্যই ধর্ম্ম, তোমার জন্যই কর্ম্ম, তোমার জন্যই সংসার, তোমার জন্যই অসংসার। আমার প্রয়োজন না থাকিলেও তোমার প্রয়োজনেই আমার প্রয়োজন। তোমার আজ্ঞা—তোমার কার্য্যই আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সংসার, অসংসার সবই। তোমার আজ্ঞা পালনেই—তোমার প্রয়োজন সাধনেই আমার আহ্লাদ, প্রেম, ভাব, মহাভাব। তুমি যা বলিবে, তাহাই হইবে। কে তাহার অন্যথা করিবে?"

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন,—'কানাই তোমায় পুনরায় সংসার পাতাইতে হইবে।'

কানাই কহিলেন,—"ঠাকুর এ বৃদ্ধ বয়সে কে আমায় কন্যা দিবে?"

ঠাকুর উত্তর করিলেন,—"ভগবদিচ্ছায় হইবে। তাঁহার ইচ্ছায় কি না হয়।"

কানাই করযোড়ে কহিলেন,—"জানি আমি যাহা বলিতেছি তাহা তোমারই ইচ্ছা। তুমিই আমার রসনাযন্ত্র সঞ্চালিত করিতেছ। কিন্তু ঠাকুর যাহা বলাইলে তাহা দেখিয়া যেন কৃতার্থ হই!"

ফকির কহিলেন—"কানাই আমার প্রয়োজনেই তোমার এখানে আসা যাহা দেখিতে চাহিলে তাহা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে।"

এই বলিয়া ফকির উঠিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া কানাই ঘোষ বলিলেন,—"ঠাকুর পলাইবে কোথা? কথা দিয়া বাঁধা পড়িয়াছ। ভগবৎ ইচ্ছা পূর্ণ কর, তার পর যাইও।"

ফকির কহিলেন,—"দেখ কানাই! ভক্তিযোগ থাকিলে যখন ডাকিবে, তখনই উত্তর পাইবে। আপন বাক্য সত্য হইলে সকলই সত্য হইবে। ভালবাসিলেই দেখিতে পাইবে। হৃদয়ে একাগ্রতা জন্মিলে, প্রিয়তমকে দেখিবার জন্য হৃদয় অধীর হইলে প্রিয়তম দেখা না দিয়া কি থাকিতে পারে? তৃষ্ণা আছে বলিয়াই জলের এত আদর। যাহার তৃষ্ণা আছে জল যেখানেই থাকুক, সে জল খাইবে। ভগবৎ কথা স্মরণ থাকিলে হাতে হাতে বুঝিয়া পাইবে—নগদ সওদা, ইহা পরকাল নয়!"

কানাই কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি ভিক্ষা করিলেন, ভগবৎ ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া ফকির প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর যথাকালে ঘোষ মহাশয় দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিলেন, বৃদ্ধ বলিয়া কন্যার অভাব ঘটিল না, সেই বিবাহের ফলে সময়ে তাঁহার এক পুত্রও জন্মিল, তিনি সেই পুত্রের নাম রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ!

পঞ্চম পল্লব।

প্রভাতে ফকির ঠাকুরকে দর্শন।

শ্যামচাঁদ নামক একজন বৈষ্ণব ভোরে উঠিয়া দেখে, ফকির ঠাকুর তাঁহার কুটীরে যথারীতি বসিয়া আছেন। শ্যামচাঁদ বলিল "ঠাকুর আপনি মধ্যে মধ্যে কোথায় যান, আপনার অদর্শনে আমরা যে অধৈর্য্য হই।"

ফকির কোন উত্তর করিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র। সেই সময়ে পাল মহাশয় ও সতী দেবী তথায় আসিলেন। পাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কানাই ঘোষের সংসার হইল না কি?"

ফকির কহিলেন—"দুই এক দিনের মধ্যেই ভগবৎ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"

পাল মহাশয় কহিলেন,—"অন্য ভগবান দেখি নাই, তোমা ছাড়া ভগবান আর আছে কি?"

ফকির কহিলেন,—"আমি জীব, ভগবৎ দাস—তুমি আমায় ভগবান বলিয়া আমার অহঙ্কার বাড়াইতেছ কেন?"

পাল মহাশয় কহিলেন,—"তুমি জীব হইলেও মুক্ত। আমার মত ত বদ্ধ জীব নও—তাই তুমি পূর্ণ।"

এই ভাবে নানা কথোপকথনের পর তত্ত্বোপদেশের মধ্যে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে বাইশজন ভক্ত পাল মহাশয়ের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ফকির ঠাকুরের নিকট সত্যনাম গ্রহণ করিল।

সেই সময় এক আউলিয়া এই গীতটী গাহিল।

গীত।

এ ভাবের মানুষ কোথা হ'তে এলো। এঁর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল॥ এঁর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটী মন, জয় কর্ত্তা বোলে, বাহুতুলে, কল্লে প্রেমে ঢলাঢল॥ এঁর ছেঁড়া কাঁথা গায়, উনবিংশতি চিহ্ন পায়, এযে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এঁর হুকুমে গঙ্গা শুকাল॥

ফকিরের শিষ্য-শাখা

বাইশ ফকিরের নাম।

শুন সবে ভক্তিভাবে নামমালা কথা। বাইশ ফকিরের নাম ছন্দেতে গাঁথা॥
জগদীশ পুরবাসী বেচু ঘোষ নাম। শিশুরাম কানাই নিতাই নিধিরাম॥
ছোট ভীমরায় বড় রমানাথ দাস। দেদোকৃষ্ণ গোদাকৃষ্ণ মনোহর দাস॥
খেলারাম ভোলানাড়া কিনু ব্রহ্মহরি। আন্দিরাম নিত্যানন্দ বিশু পাঁচকড়ি॥
হটুঘোষ গোবিন্দ নয়ান লক্ষ্মীকান্ত। ইহারাই ভক্তিপ্রেমে অতিশয় শান্ত॥
পূর্ব্বের আনুসঙ্গী এই বাইশ জন। এরাই করিল আসি হাটের পত্তন॥

প্রথম বৈঠক।

ফকির ঠাকুর এই বাইশ জনকে লইয়া তাঁহার সেই কুটীরে শুক্রবার রাত্রে বৈঠক করিলেন। শুক্রবারের যাবতীয় নিয়ম পদ্ধতি আচার আচরণ শিক্ষা দিলেন। সেই জন্য সেই প্রথা এখনও অনুসৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক শুক্রবারে যে স্থানে বৈঠক বসে সেই স্থানেই মহা মহিমাময় দীনের সহায় কর্ত্তা-বাবার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই বাইশ ফকিরের মধ্যে

রামশরণ পাল মহান্ত গুরু হইলেন। এই ঘটনায় একটুকু বিশেষ প্রমাণিত হইল যে, আর কাহার উপর কোনরূপ কর্তৃত্বই রাখে নাই। কর্ত্তাবাবার কর্তৃত্ব ফকির ঠাকুরের উপর পূর্ণভাবে বজায় থাকিল। ফকির ঠাকুর ঐ বাইশজন শিষ্যকে আদেশ করেন ও শিক্ষা দেন যে কর্ত্তাবাবার ভজনেই আমার ভোজন। ভোজন ও ভজন, তথা ভোক্তা আর ভক্ত, এই দুইয়ের একই তাৎপর্য্য। ইহাতে আরও জানা যায় যে, কর্ত্তাকে ভজিবার বিষয়ে ফকিরঠাকুরই মূল, তারপর দ্বিতীয় স্থানে ঐ বাইশজন, ফকিরঠাকুরই কর্ত্তা-ভজন ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক।

বৈঠকে উপদেশ।

১ম দফা। যে ব্যক্তি প্রথম এই সত্যধর্ম্ম আশ্রয়ে ইচ্ছা করিবে, কোনরূপ হঠাৎ-বাক্যে, তাহাকে কোনও বস্তু প্রদান করিবেনা, অর্থাৎ যতক্ষণ না তাহার চরিত্র, ভাব, ভক্তি, বিশ্বাস এবং অনুরাগ-বিশিষ্ট মত দেখহ ও সরলান্তঃকরণ জানহ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে বিশ্বাস করিয়া একবাক্যে সমস্ত বস্তু প্রদান করা অনুচিত। যাহাকে যাহা দিতে হয় বুঝিবে, অবশ্য দুই একবার ঘুরাইয়া, যদি তাহাতে তাহার অনুরাগ বর্দ্ধিত বই হ্রাস-প্রাপ্ত না হয় তবেই দিবে। তাহার গরজ যে পর্য্যন্ত তোমাতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি কোনও গরজ যেন করিও না। বিবিধ বিধানে অগ্রে তাহাকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দান করিবে, তৎপরে সিদ্ধবীজাদি...... প্রণালীমত, যাহা তোমাকে দেওয়া হইল, তাহা পাত্র বুঝিয়া প্রদান করিবে।

২য় দফা। দায়ীকের যাবতীয় পাপরোগের নিকাশ অগ্রে লইয়া, তাহার প্রতি যাহা বন্দোবস্ত করিবার তাহা করিয়া, তাহাকে এই বীজাদি কেবল তিন সন্ধ্যা স্মরণ মনন করিতে কহিবে, তাহা হইলেই সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইবে। এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া চলিবে; দীন দুঃখী, কাঙ্গাল-আতুর ইত্যাদির প্রতি সবিশেষ কৃপাদৃষ্টি রাখিবে। তাহা হইলে কোনদিকে কোন অভাব থাকিবে না—কতদিক হইতে কত অর্থ আসিবে, এবং কত বিলাত-বরাতও হইতে থাকিবে। কোন দায়ীক ব্যক্তিকে মানসিক যাহা অঙ্গীকার করাইবে, বাক্যসিদ্ধে সেই মানসিক যাহা অতঃপর প্রাপ্ত হইবে, সেই সমস্ত টাকা অর্দ্ধেক কর্ত্তা মায়ের সংসারে দিবে; আপনি ভক্ষণ করিবে না। তবে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা তোমাকে প্রদান করিবে, তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিতে পারিবে। এই সমুদয় কার্য্যের অন্যথা যে দিন হইবে, সেইদিন ধর্ম্ম কর্ম্ম এককালে লোপ পাইবে জানিবে, এবং অনেক মুস্কিলও ঘটিবে। যে পর্য্যন্ত পয়নামীতে থাকিবে* সেই পর্য্যন্ত দায়ীকের নিস্তার হইবে।

যে রমণী পুরুষ-সহবাসেচ্ছাকে অন্তর হইতে দূর করিতে পারক হইয়াছে, এবং যে পুরুষ রমণী-সহবাসেচ্ছা-বর্জ্জিত, সেই স্ত্রীলোক এবং পুরুষই সত্যভজনার প্রকৃত অধিকারী। কাম-রিপু যে রমণী বা পুরুষের হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত, সে সত্যভজনা করিতে পারে না! কেননা, সময়ে সময়ে রমণী ও পুরুষ এক স্থানে বসিয়াও এই সত্যধর্ম্ম ভজিতে হয়, এরূপ অবস্থায়, কেমন

---

* পয়নামী অর্থে গোলামী।

করিয়া তাহা হইলে 'সিদ্ধি' হইতে পারিবে? সত্যভজনার কালে, কি পুরুষ, আর কি স্ত্রী সকলেরই এমন বাহ্যজ্ঞান বা দৃষ্টিশূন্য হইয়া থাকা আবশ্যক যে, যতক্ষণ তাঁহারা সেখানে থাকিবেন, ততক্ষণ এটি যেন একবারও স্মৃতিপথে আইসে না যে, তথায় তাহারা পুরুষ এবং স্ত্রী এই দুই জাতিই বর্ত্তমান আছেন;—যেন তাহারা সকলেই একজাতি, বিশেষত এক আত্মা, এইরূপ জ্ঞান করিয়াই, এক্ষেত্রে সমবেত থাকিতে হইবে, তবেই ভজনা হইবে; এবং তবেই পরিণামে 'সিদ্ধি' লাভ করিবে।

কর্ত্তা-ভজন।

জগতের কর্ত্তা যিনি তাঁহারি ভজন।
কর্ত্তা-ভজন নামে তাই ভরিল ভুবন॥
নারী-নর দুইজনে হইবে চেতন।
শক্তির মন্ত্রেতে কর শক্তির পূজন॥
সত্য নামে নিষ্কাম হইবে যেই জন।
এ ভবে হবে না আর তার আগমন॥
নারী হিজ্‌রে পুরুষ খোজা এইতো লক্ষণ।
সাবধানে কর সবে সাধন ভজন॥
তত্ত্ব কথা আছে গাঁথা ইহার ভিতরে।
বুঝিলে অভাব কিছু না রবে সংসারে॥
সুধা ফেলে বিষ পানে মত্ত অতিশয়।
বিষ ত্যজি সুধা খাও ওহে মহাশয়॥
আগেতে করহ সবে সত্যের করণ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হও অনুক্ষণ॥

আপনি হইলে সত্য সব সত্য হয়।
তাই বলি লও সবে সত্যের আশ্রয়॥
অন্ধকার ঘুচে যাবে সত্য কথা কহ।
সত্য নাম স্মরণ করহ অহরহ॥
সত্যগুরু চট্টরাজ রাজ নারায়ণ।
সে পদ লভিতে মনু করে আকিঞ্চন॥

অন্তর্ধান।

ঐ সকল উপদেশের পর, কান্থা রাখিয়া ফকির ঠাকুর চলিয়া যাইবেন, এমন সময়ে সতী মা আসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন,—"বাবা! তুমি এত দিনের পর এ সংসার আঁধার করিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে? আমাদের এমন কি দোষ ত্রুটি দেখিলে যাহার জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ?"

সকল কথা শুনিয়া ফকির কহিলেন,—"মা! এ সংসার আঁধার করিয়া যাইব না, বরং এ সংসার উজ্জ্বল করিবার জন্য শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিব। আর দোষ ত্রুটির কথা বলিতেছ—সেটা তোমাদের ভুল। আমি তোমাদের আদর যত্ন এবং স্নেহ নিষ্ঠায় এমন বাঁধা পড়িয়াছি যে, তোমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।"

ফকির ঠাকুর যাইবার সময় দোল রাসের বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। কর্ত্তাবাবা ও সতী মা উভয়ে অপলক-নেত্রে ফকিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ফকিরঠাকুর অন্তর্ধান হইলেন। তখন কর্ত্তাবাবা অন্তরের ধন ফকির ঠাকুরকে অন্তরেই দেখিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে দুই

জনে লোক চক্ষুর অন্তরালে দেশ দেশান্তর সরিৎ নদীর ব্যবধানে থাকিলেও উভয়ে উভয়ের অন্তর ছাড়া হইলেন না। যখন ইচ্ছা নয়ন মুদিলেই অন্তরের ধনকে অন্তরে দেখিতে পাইতেন। ফকির যখন যেখানে থাকিতেন, যাহা করিতেন, কর্ত্তাবাবা প্রতিক্ষণে তাহা হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত দেখিতেন। আবার তিনিও যাহা করিতেন, যাহা ভাবিতেন, ফকিরের অবিদিত থাকিত না। এইভাবে তাঁহাদের দিন চলিতে লাগিল,—অন্তরে অন্তর যোগে পরস্পরের সুখ সম্মিলন ঘটিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পল্লব।

বোয়ালিয়ায়-ফকির-ঠাকুর।

বোয়ালিয়া গ্রামে নফরচন্দ্র বিশ্বাস নামে নির্ম্মলচরিত্র স্বধর্ম্ম পরায়ণ এক মহাত্মা বাস করিতেন! ফকির ঠাকুর তাঁহার ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন! অপুত্রক পুত্রমুখ দেখিলে, দীন দরিদ্র প্রচুর ধনসম্পত্তি পাইলে, যেরূপ প্রীত হয়, ফকির ঠাকুরের সন্দর্শন লাভ করিয়া নফর বিশ্বাসও সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। বিশ্বাস মহাশয় সযত্নে নূতন ঘরের বেদীর উপর আসন দিয়া তাঁহাকে বসাইলেন।

অগ্নি যেমন বস্ত্রখণ্ডে লুক্কায়িত থাকে না, প্রভাকরের প্রভা যেমন চিরদিন মেঘজালে সমাচ্ছন্ন থাকে না, তেমনি ফকির ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বেশী দিন

বোয়ালিয়াবাসীর নিকট গোপন রহিল না! তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত তত্ত্বকথা শুনিয়া অনেকে তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িল। অনুরাগ হইতেই ভক্তির বিকাশ হয়। শেষে তাহারা তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া দাঁড়াইল। বোয়ালিয়া গ্রামের ভক্তদের (১)"ভগবেনে" ও ঘোষপাড়ার ভক্তদের "ভগবজ্জন"* কহে। নামের পার্থক্য থাকিলেও উভয় সম্প্রদায়ের ভজন সাধন ও রীতি পদ্ধতির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

নফর বিশ্বাসের গৃহে অবস্থান কালে ফকির ঠাকুর কাল-কাসন্দার পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইতেন। নফর এই প্রসাদ পাইয়া জীবন মুক্ত হইলেন।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে উক্ত বোয়ালিয়া গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির একমাত্র পুত্র সহসা কাল-গ্রাসে পতিত হইল। নফর বিশ্বাসের অনুরোধে ফকির ঠাকুর তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। এই সংবাদ অচিরাৎ লোক-মুখে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িবামাত্র প্রত্যহ শত শত লোক এই অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য নফর বিশ্বাসের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ফকির ঠাকুর দিবারাত্র বেদীর উপর উবু হইয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার নিকটে যাইবার কাহারও অনুমতি ছিল না বা তিনি কাহারও সহিত বেশি কথা কহিতেন না। দর্শনপ্রার্থীরা দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিভরে মস্তক অবনমিত করিয়া চলিয়া যাইত।

(১) এরা ভগবানে অটল সেই জন্য ভগবেনে।

* যে ভগকে বর্জ্জন করিল সেই ভগবজ্জন হইল।

বোয়ালিয়ায় তাঁহার কার্য্য শেষ হইল। সুতরাং এক দিন সকলে সহসা দেখিল ফকির ঠাকুর অন্তর্ধান হইয়াছেন। এই ঘটনায় গ্রামবাসীরা যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেও বিশ্বাস মহাশয় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি পাড়ারি গ্রামের একটী উত্তম স্থানে তাঁহার সমাধি দিলেন এবং স্বয়ং সেই সমাধির নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন! প্রত্যহ গভীর নিশায় তাঁহার সহিত ফকির ঠাকুরের কথাবার্ত্তা হইত। কিছু দিন পরে আর তাঁহার উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন এইবার ফকির ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন। যেখান হইতে আসিয়াছিলেন আবার সেই স্থানে গমন করিয়াছেন। পরদিন তিনিও স্বেচ্ছায় দেহ রক্ষা করিলেন। তাঁহার পুত্রগণ পিতৃদেহ ইচ্ছামতি নদীতীরে দাহ করিয়া, তাঁহার নাভিঅস্থি লইয়া আসিল এবং ফকিরের সমাধি পার্শ্বে সমাহিত করিল। অদ্যাবধি পাড়ারি গ্রামে ফকির ঠাকুরের সমাধি বিদ্যমান আছে।

সপ্তম পল্লব।

শ্রীযুত্ দুলালচাঁদের আবির্ভাব।

একদিন রাত্রে সতী মা স্বপ্ন দেখিলেন, সেই ফকির বালক বেশে তাঁহার কোলে বসিয়া মধুময়—কণ্ঠে বলিতেছেন,—"মা আমি এসেছি।" তিনি স্বপ্নাবেশে চাহিয়া দেখিলেন, বালকের রূপের প্রভায় তাঁহার আঁধার ঘর আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

মরি মরি কি রূপ ! যেন এককালে শত শশাঙ্কের উদয় হইয়াছে। আনন্দচাঞ্চল্যে সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কই ঘরে ত কেহ নাই কেবল শূন্য ! তবে কে তাঁহাকে মধুমাখা মা বোলে সম্বোধন করিয়া তাঁহার কর্ণবিবরে সুধাসিঞ্চন করিয়া গেল? তাঁহার চাঞ্চল্যের হ্রাস হইলে বুঝিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কিন্তু ঘর যে এখনও দিব্যগন্ধে আমোদিত, তাঁহার কর্ণকুহরে সে মধুময় বাণী এখনও যে প্রতিধ্বনিত। পুলকে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে আবার সুষুপ্তিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই পাল মহাশয়কে পূর্ব্ব রাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। শুনিতে শুনিতে পালমহাশয়ের সর্ব্ব শরীর পুলক-শিহরণে কদম্ব-কেশরের মত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অগতির গতি ফকির যে শীঘ্রই পুত্ররূপে তাঁহার ঘর আলোকিত করিবেন, তাহার পূর্ব্বাভাস জ্ঞাত হইয়া তিনি সাগ্রহে সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শুভ ১১৮২ সালের আষাঢ় মাসের শুভদিনে সতী-মার গর্ভসঞ্চার হইল এবং দশমাস পরে অর্থাৎ উক্ত সালের ৩রা চৈত্র শুক্ল সপ্তমী তিথিতে ধরায় ত্রিদিব-চাঁদ দুলালচাঁদের আবির্ভাব হইল।

গোকুলে ভাগ্যবান বসুদেবের ঔরসে শ্রীভগবান যেমন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনই ঘোষপাড়া গ্রামে রামশরণ পালের পুত্ররূপে দুলালচাঁদ অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, মহম্মদ, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিলে একটী দীপ্তিময় তারা যেমন পশ্চিমদিকে উদিত হইয়াছিল, এবং তদ্দর্শনে আর্য্য ঋষিগণ ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ যেমন নররূপী ভগবানের আগমন-বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তেমনি দুলালচাঁদের অবতরণেও, সেই সপ্তমী নিশার ত্রিযাম অতীত হইলে, শুক তারার ঠিক বাম পার্শ্বে আর একটী অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিময় নক্ষত্র কেবল মাত্র সেই নিশার জন্য উদয় হইয়াছিল। তত্ত্বদর্শী পূর্ব্ব ঋষিগণ এই অভূতপূর্ব্ব নৈসর্গিক লক্ষণ দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে, ফকির ঠাকুর তৃতীয় কায়া লইয়া রামশরণ পালের গৃহে পুত্ররূপে উদয় হইলেন।

একদিন নন্দালয়ে যেমন মুনি ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন এবং জ্যোতির্ব্বিদমণ্ডলী যেমন মেরির ভবনে জগতের পরিত্রাতাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, আজও তেমনি বহু সাধু সন্ন্যাসী, যোগী মোহান্ত এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রেমে পুলকিত এবং আনন্দে বিভোর হইয়া ঘোষপাড়ায় দুলালচাঁদকে দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব দেবকান্তি শিশু। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যেন শারদ শশাঙ্ক গগনচ্যুত হইয়া সতীমার কোল আলো করিয়া বসিয়া আছে। তাঁহারা আরও দেখিলেন শ্রীঅঙ্গে যে সকল চিহ্ন বিদ্যমান আছে, তাহা কখনই সামান্য বালকে সম্ভবে না। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী এবং ভগবানে বিশ্বাসবান কেবল তাঁহাদেরই চক্ষে ঐ সকল দেববিভূতি-

ঐ সকল অনন্যসাধারণ নিদর্শন প্রকটিত হইল কিন্তু যাহারা সংসারে আসিয়া চক্ষে মোহের কাজল পরিয়াছে, দু দিনের সুখৈশ্বর্য্যকে চিরস্থায়ী ভাবিয়া শক্তিমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, যাহারা সংসারচক্রের ধোঁকায় পড়িয়া সুবর্ণ ফেলিয়া শুধু আঁচলে গেরো বাঁধিতেছে এবং যাহারা বিবেকের অবাধ্য হইয়া প্রেতের ন্যায় সংসার ক্ষেত্রে নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতেছে, তাহারাই কেবল বিভূতি আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় দুলালচাঁদের ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইল না। তাহারা সাধারণভাবে দেখিল তাহাদের ঘরে নিত্য যেমন মানব শিশুর জন্ম হইতেছে এও তাই। ভগবান সহজে কাহাকেও স্বরূপে দেখা দেন না, যে তাঁহাকে যে ভাবে দেখিতে চায়, তিনি সেই ভাবে ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

বিন্দু বিন্দু বারিপাতের উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে আকাশে যেমন বিচিত্র রামধনুর উদয় হয়, তেমনি দুলালচাঁদের ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্য আজ মানব-সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া, যে অপার্থিব সৌন্দর্য্য-সুধার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। পরিণামে যে অপরূপ রূপ-সাগরে অবগাহন করিয়া লক্ষ লক্ষ তাপিত অন্তর সুশীতল হইবে, যে রূপের ছটা দেখিয়া দিক্‌ভ্রান্ত পান্থ গম্য পথের সন্ধান পাইবে, আজ তাহার সূচনা হইল। আজ যিনি সামান্য মানব শিশুরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইলেন, তিনিই একদিন জগৎবাসীর সম্মুখে তাহাদের মোহান্ধকার দূর করিবার জন্য যে শান্তোজ্বল দীপ্তছটা ধরিবেন, তাহারই আলোকে দিশেহারা জীব তাহাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবার সহজ

সুগম পন্থা অন্বেষণ করিয়া লইতে সমর্থ হইবে। দুলালের এই অতুল মহিয়সী কীর্ত্তি অনন্ত কালের জন্য দেদীপ্যমান থাকিবে, কালের শত ঝঞ্ঝাবাতেও তাহার দীপ্ত ভাতির অপচয় ঘটিবে না।

বাল্যলীলা।

শশি-কলার ন্যায় দুলালচাঁদও দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বিবর্দ্ধমান অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি অঙ্গ হইতে সৌন্দর্য্যধারা লীলায়িত হইয়া তাহার দীপ্তচ্ছটায় পাল মহাশয়ের গৃহ যেন আলোকিত করিয়া তুলিতে লাগিল। বালকের সে অতুল রূপ, লীলাচঞ্চল অঙ্গভঙ্গী এবং হাস্যবিকশিত মুখপদ্ম দেখিয়া পাল মহাশয় ও সতীমার আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিত, পুলকপ্লাবনে হৃদয় ভরিয়া যাইত। দিবারাত্র সেই সোণার চাঁদ দুলালচাঁদকে বক্ষে ধরিয়াও তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোমতীকে স্নেহ-ডোরে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনি দুলালচাঁদও সুমধুর অস্ফুট আধ আধ কথায় সতীমাকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। মাতৃ মুখের মধুর চুম্বন স্পর্শে শশিকরচুম্বিত সাগরবারির মত বালকের পুলক সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া যখন হাসির আকারে দুকূল ছাপাইয়া প্লাবন ছুটিত, তখন স্নেহোদ্বেলিত হৃদয়ে জননী তাঁহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতেন। বালকের পুলকসিন্ধু এবং জননীর স্নেহসিন্ধু তখন পরস্পর মিশিয়া যে সুধা সমুদ্রের সৃষ্টি করিত, তাহা জগতের অন্যত্র দুর্লভ। শিশু এই ভাবে

জননীর স্নেহ-মন্দাকিনীর পবিত্র ধারায় পরিপুষ্ট হইয়া দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সতীমাও জগতের পরিত্রাতাকে নয়ন-পুতলি তুল্য জ্ঞান করিয়া সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

যাঁহারাই জগতের পরিত্রাতারূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদেরই অসামান্য ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ নানাদিক দিয়া নানাভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, পুরাণেতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত নিতান্ত দুর্লভ নয়। সর্পশিশু কখনই বিষশূন্য হয় না।

অতি শৈশবকাল হইতেই দুলালচাঁদের কার্য্যাবলী দর্শনে লোকে স্তম্ভিত হইয়া কত কথা বলিত; পাল মহাশয়ের ছেলেটী যে, সাধারণ ছেলে নয়, তাহা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

পাল মহাশয় ও সতী মা ফকির ঠাকুরের নিতান্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক ভোগাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার উদ্দেশে নিবেদিত করিয়া তবে প্রসাদ পাইতেন। কোন দিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত না। এক্ষণে দুলালচাঁদ হামাগুড়ি দিতে শিখিলে সেই চিরাচরিত নিয়মে ব্যাঘাত ঘটিতে আরম্ভ হইল। একদিন তাঁহারা সবিস্ময়ে এবং সভয়ে দেখিলেন ফকির ঠাকুরের উদ্দেশে প্রস্তুত ভোগাদি তাঁহাকে নিবেদিত করিবার পূর্ব্বেই দুলালচাঁদ তাহা ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সতী মা তাহার পর দিন সাবধান হইলেন। তিনি যথারীতি ভোগ রন্ধন করিয়া, ভোগ ফকিরঠাকুরের ঘরে রাখিয়া

দ্বারে শিকল তুলিয়া দিলেন। দুলালচাঁদ তখন অঙ্গনে খেলা করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া দেখেন দুলাল অঙ্গনে নাই, তাড়াতাড়ি ফকিরঠাকুরের ঘরের শিকল খুলিয়া দেখেন দুলাল হাসি হাসি মুখে সেই ক্ষিরভোগ ভোজন করিতেছেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, বালককে ভৎর্সনা করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু দুলাল এমনই মধুর হাসি হাসিয়া তাঁহার কোলে উঠিবার জন্য নবকিশলয়তুল্য তাঁহার কচি হাত দুখানি বাড়াইয়া মা বলিয়া ডাকিলেন যে, সতী মা সব ভুলিয়া গেলেন। বালককে বুকে তুলিয়া লইয়া সহস্র চুম্বনে তাহার ফুল্ল গণ্ড ভরিয়া দিলেন। ইহার পর প্রতিদিনই এইরূপ বিভ্রাট ঘটিত, সহস্র চেষ্টা করিয়াও সতী মা ইহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন নাই।

যুগে যুগেই এইরূপই হইয়া আসিতেছে। লীলাময়ের সকল লীলার মহান্ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন ভিন্ন ভাব নাই,—তাই অনেক বিষয়ে সময়ে সময়ে অনেকটা মিল থাকে। ভগবানের কৃষ্ণাবতারে মহামুনি কণ্ব নন্দালয়ে কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন দামাল ছেলে। কণ্বমুনি স্বপাক ভোগ প্রস্তুত করিয়া আহারের পূর্ব্বে ইষ্টদেবকে নিবেদিত করিয়া দিবার উদ্দেশে চক্ষু মুদিয়া যেমন গোবিন্দায় নমঃ বলিয়া ভোগ নিবেদন করিলেন, অমনি কোথা হইতে কৃষ্ণ আসিয়া থাবায় থাবায় সেই অন্ন লইয়া মুখে তুলিতেছেন। যশোদা ছুটিয়া আসিয়া প্রমাদ গণিলেন। ঋষি বালকের উচ্ছিষ্ট কেমন করিয়া খাইবেন, সুতরাং যশোমতীর অনুরোধে পুনরায় রন্ধন করিলেন এবং আহারে বসিবার পূর্ব্বে যশোমতীকে বলিলেন—"এবার

৬

মা তোমার ছেলেটীকে সাবধান করিয়া রাখ এবার যেন আহার্য্য নষ্ট না হয়।”

যশোমতী তদুত্তরে কহিলেন,—‘না, এবার আর কোন ভয় নাই, তাহাকে ঘরের মধ্যে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।’

কণ্ব ঋষি আবার আহারে বসিলেন। এবারও যেমন হৃৎপদ্মে ইষ্টদেবকে ধারণা করিয়া গোবিন্দায় নমঃ বলিয়া ভোগ নিবেদিত করিয়া চক্ষু মেলিলেন,—দেখিলেন দুষ্ট ছেলে দুই হাতে করিয়া অন্ন তুলিয়া মুখে পুরিতেছে।

যশোমতী বালকের দুরন্তপনায় কুপিতা হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন; ঋষি কহিলেন,—“শিশুকে মারিয়া ফল নাই, অজ্ঞান বালক বইত নয়। বোধ হয় বাড়ীর কেহ দ্বার খুলিয়া দিয়া থাকিবে। আমি পুনরায় পাক করিয়া লইতেছি।”

তাহাই হইল, যশোমতী এবার বালককে বন্ধন করিয়া ঘরে চাবি দিলেন এবং নিজে দ্বারের নিকট প্রহরায় রহিলেন। বার বার তিন বার। এবারও তাই—যাই গোবিন্দায় নমঃ বলা, অমনি দামোদরের অন্ন ভক্ষণ আরম্ভ। যশোমতী হার মানিয়া অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণ মাকে তদবস্থ দেখিয়া মা মা বলিয়া তাঁহার কোলে উঠিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিল।

কণ্বঋষির চক্ষে দরদরধারে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। এতক্ষণে তাঁহার মোহান্ধকার দূর হইল। তিনি পরম পুলকে বালকের উচ্ছিষ্ট লইয়া আহার করিতে উদ্যত হইবামাত্র যশোমতী কাঁদিয়া কহিলেন,—“ঠাকুর কর কি; অমন কাজ

করিও না, আমার গোপালের অকল্যাণ হইবে! ও যে উচ্ছিষ্ট অন্ন।”

হাসিয়া ঋষি কহিলেন,—“উচ্ছিষ্ট নয় মা! এ আমার পরম ইষ্ট! আর তোমার গোপালের অকল্যাণের কথা বলিতেছ—সে ভয় নাই—তোমার ও ছেলেটী কল্যাণ ও অকল্যাণের অতীত। আমি মহা পাপিষ্ঠ তাই ইষ্টদেবকে চিনিতে পারি নাই। আমার মোহ ঘুচেছে মা; আমি যতবার গোবিন্দায় নমঃ বলে ইষ্টদেবকে অন্ন দিয়াছি, ততবারই গোবিন্দ আমার নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করেছেন। আজ আমি ধন্য হইলাম!” এই বলিয়া ঋষিবর আহার করিতে বসিলেন।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম যুগে যুগে যুগাবতার লীলাময়ের লীলার মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-কালে যেমন কতকগুলি রাখাল সখা মিলিয়াছিল এবং তাহাদিগকে লইয়া যেমন খেলাচ্ছলে নানা লীলা করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুলালচাঁদেরও গ্রামস্থ অনেকগুলি খেলুড়ে জুটিয়াছিল। কৃষ্ণের ছিল কদমতলা, দুলালচাঁদের খেলার স্থান হইল ডালিম-তলা। এই ডালিমতলায় সহচরগণে পরিবৃত হইয়া শৈশব সুলভ অনেক খেলাই খেলিতেন। ধূলা মাটী লইয়া নিত্য নূতন খেলার আয়োজন হইত। জগতের ভাঙ্গাগড়াই যাঁহার খেলা এই বাল্যখেলার মধ্যেও তাহার অনেক আভাস পাওয়া যাইত। সঙ্গে যাহারা সহচর থাকিত—খেলার উপকরণ যোগাইত—গাছে ধূলা কাদা মাখিয়া আনন্দ করিত কিন্তু সে খেলার মর্ম্ম বুঝিতে পারিত না: সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া

চিরকালই তিনি ধূলা খেলা করিতেছেন—আমাদের ধূলা মাখাই সার হয়, খেলিত বটে কিন্তু খেলার মর্ম্ম বুঝিতে পারিত না।

বালকেরা প্রভাতে উঠিয়া মধুরকণ্ঠে প্রভাতী গান গাহিত। দুলালচাঁদ সেই গান শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং যাহারা সেই গান গাহিত তাহাদের সহিত মিশিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতেন। সতী মা যাহা কিছু বাল্য ভোগ দিতেন, সকলে মিলিয়া প্রেমানন্দে ভক্ষণ করিতেন।

পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে পালমহাশয় শুভদিনে দুলালচাঁদের হাতে খড়ি দিয়া গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। দুলাল পাততাড়ি বগলে লইয়া অপরাপর বালকদিগের সহিত পাঠশালায় যাইতেন এবং বিদ্যালয়ের ছুটির পর তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া বালসুলভ নানা ক্রীড়ায় আনন্দে দিনাতিপাত করিতেন।

গ্রাম্য প্রবাদে বলে,—"যে মূলে বাড়ে, তার পাতায় চেনা যায়।" দুলাল বালক হইলেও তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যে উজ্জ্বল এবং মহিমামণ্ডিত হইবে তাহার অনেক নিদর্শন বাল্য জীবনেই পাওয়া গিয়াছিল। বালকের অসামান্য মেধা, ক্ষুরাগ্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অনন্যদুর্ল্ভ স্মরণশক্তি দেখিয়া গুরু মহাশয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। বালক একবার যাহা শুনে তাহাই শিক্ষা—করে। বালক বুদ্ধির অনধিগম্য অতি দুরূহ বিষয়ও দ্বিতীয় বার শিক্ষা দিবার আবশ্যক হয় না। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলের ন্যায় যেন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কণ্ঠাগ্রে অবস্থান করিতেছিল, এক্ষণে গুরুপদেশে তাহার বিকাশ এবং পরিণতি

ঘটিতে লাগিল। দুলাল অত্যল্প কালমধ্যে পাঠশালার তাবৎ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন, সুতরাং তাহাকে শিক্ষা দিবার শক্তি আর গুরু মহাশয়ের রহিল না। এক মহা পণ্ডিত দুলালচাঁদকে পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট কাব্য, অলঙ্কার, সমগ্র দর্শন ও বেদ বেদান্তাদি কণ্ঠস্থ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঈদৃশ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া পণ্ডিতপ্রবর অপার বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—কে এই অদ্ভুত বালক? এমন আশ্চর্য্য ঘটনা ত নরলোকে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। নিশ্চয় কোন দেবতা নররূপ পরিগ্রহ করিয়া বালকবেশে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছে। নচেৎ মানব শিশুতে এত মেধা, এত ধীশক্তি, বুদ্ধির এত প্রাখর্য্য এবং স্মরণ শক্তির এত দূর প্রাচুর্য্য কখনই সম্ভবপর নয়।

এইরূপে অত্যল্পকালের মধ্যে দুলালচাঁদ নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে পিতামাতার আর আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না! এমন কুলপাবন পুত্রের জনক জননী হওয়া বড় কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

বিদ্যাশিক্ষা ও বাল্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে দুলালচাঁদ দিন দিন শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ পুষ্টতালাভ করিয়া কৈশোর সমাগমের আভাস জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তিনি বাল্যাবধি শান্ত শিষ্ট, মিষ্টভাষী এবং লোকপ্রিয় ছিলেন। বাল্যাতীত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের সংসারে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিল। সে পরিবর্ত্তন যেমন আকস্মিক, তেমনই শোকাবহ।

অষ্টম পল্লব।

পাল মহাশয়ের দেহরক্ষা।

পাল মহাশয়ের কাল পূর্ণ হইয়াছে, তিনি আজ অন্তিম শয্যায় শায়িত। পার্শ্বে সহধর্ম্মিণী সতী সাধ্বী সরস্বতী দেবী, শিশু পুত্র দুলাল, আত্মীয় বন্ধু এবং বাইশ ফকিরের একজন বিমর্ষ মনে বসিয়া আছেন। তাঁহার সময় আসন্ন দেখিয়া সরস্বতী যিনি এখন সতীমা বা কর্ত্তামা নামে সাধারণের নিকট পরিচিতা, কহিলেন,—"তুমি ত যাইতেছ, আমার দুলালের কি করিয়া যাইলে ?" পাল মহাশয় সে সকল কথার কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া পুনরায় তিনি সেই প্রশ্ন করিলেন। এবার পাল মহাশয় একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"সে ভাবনা তোমার আমার নয়, পাঁচ ভূতে যোগাইয়া দিবে।"

কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। পাল মহাশয়ের সাংসারিক অবস্থা কোন কালেই যাহাকে বেশ স্বচ্ছল বলে তাহা ছিল না। সেই সংসারে বংশের দুলাল দুলাল চাঁদের জন্ম হইয়াছে। পাল মহাশয় তাহাকে শৈশবেই ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, সম্মুখে সঙ্কটাপন্ন দারিদ্র্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সতী দেবী পরলোকযাত্রী স্বামীকে সখেদে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আমার দুলালের কি করিয়া যাইলে ?"

বাস্তবিকই পাল মহাশয় মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে দুলালের কোন ব্যবস্থা করিয়াই যাইলেন না। শিশু পুত্র কেমন করিয়া

সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে তাহার কোনই সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কোন দিন সে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াও ত মনে হয় না। কারণ কোন কালেই তাঁহার সংসারী বুদ্ধি ছিল না—জমি জায়গা দেখিতে হয় দেখিতেন গরু বাছুর গুলাকে না দেখিলে নয় অথবা পত্নীর কথায় তাহাদের তত্ত্বাবধান লইতেন, সংসারের আনা নেওয়া, লোক লৌকিকতা, রাজা মহাজনের দেনা পাওনা সবই সরস্বতী দেবী বা সতীমার তত্ত্বাবধানে চলিত, সে সকলের মধ্যে পাল মহাশয়ের কোন দিন হাত ছিল বলিয়া ত মনে হয় না। তিনি যেন এ সকল ঝঞ্ঝাট হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারিলেই নিজেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে করিতেন। এক কথায় সংসারে তাঁহার কোন আসক্তি ছিল না—জলে যেমন তেল ভাসে, তিনিও তেমনই সংসারের উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেন, জল কোন দিন তাঁহার বহিরঙ্গ ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

তাঁহার মনের যখন এইরূপ অবস্থা, যখন তিনি নির্লিপ্ত ভাবে পদ্মপত্রে জলের ন্যায় সংসারে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে পূর্ব্বেকার যোগাযোগের জন্য ফকির ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, সেই দিন হইতে তাঁহার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল—আর একটা নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হইল।

কথায় বলে রতনে রতন চেনে। ফকির ঠাকুর তাঁহাকে চিনিলেন, তিনিও ঠাকুরকে পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। তাঁহার সংসার ধর্ম্ম সব ভাসিয়া গেল—এত দিন ভাসা ভাসা যে

টুকু সংসারানুরাগ ছিল, এবার সে টুকুও লোপ পাইতে বসিল। তিনি ফকির ঠাকুরকে লইয়া উন্মত্ত হইলেন। দিনরাত্র তাঁহার কুটীরে থাকিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত আত্মসিদ্ধ যে তত্ত্ব, তাহাই শুনিতেন। দৈববাণীতুল্য সুদুর্ল্লভ সারগর্ভ সেই সকল সদুপদেশ শুনিতে শুনিতে পাল মহাশয়ের মনের সংশয় এবং হৃদয়ের অবসাদ ঘুচিয়া গেল। সংসারে থাকিয়াও কলুষতাবর্জ্জিত বিমলানন্দ যে কি অপার্থিব পদার্থ তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হৃদয়সরোবরে জ্ঞানপদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিল। তাহা হইতে যে মধু ক্ষরিত হইতেছিল, তাহা পান করিয়া তাঁহার পার্থিব সম্পদ ভোগের পিপাষা, রূপযৌবন লালসার ক্ষুধা সব মিটিয়া গেল।

জমি উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে অভিজ্ঞ কৃষক যেমন তাহাতে বীজ বপন করে, সেইরূপ পালমহাশয়ের হৃদয়ক্ষেত্র যখন আবাদের উপযুক্ত হইয়া উঠিল, তখন অবসর বুঝিয়া দয়াল ঠাকুর সর্ব্ব সিদ্ধ বীজ বপন করিলেন। শুভ মুহূর্ত্তে রোপিত এই বীজ হইতে সময়ে সংসার প্রান্তরে ঘনপল্লবান্বিত যে মহা মহিরুহের উদ্ভব হইবে, তাহার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া সংসার-আতপ-তাপে-তাপিত লক্ষ লক্ষ পাপী তাপী আরাম অনুভব করিবে এবং পাপরূপ গ্রীষ্মের দারুণ সন্তাপ হইতে অব্যাহতি পাইয়া জ্বালাময় জীবনে অমৃতের সন্ধান পাইবে। যাহা হউক পাল মহাশয় ফকির ঠাকুরের নিকট হইতে কয়েকটী গূঢ়ভাব ও ভজনের প্রণালী অবগত হইয়া, অনন্যসংসক্তচিত্তে তাহার অনবরত সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া যখন

শাণিত প্রজ্ঞারূপ অস্ত্রে বাসনার সুদৃঢ় বন্ধন ও দুশ্ছেদ্য মায়াপাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইলেন তখন তাঁহার নির্ম্মলচিত্তে প্রতিভাত হইল, "মহাপ্রভু"ই ফকিরবেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন আবার পুত্ররূপে তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন।

এই মহাসত্য যখন তাহার হৃদয়ে, শরতের সুবিমলাকাশে পূর্ণচন্দ্রের মত আলোকিত করিয়া জাগিয়া উঠিল, তখন হইতে সংসারে তাঁহার শেষ আসক্তিটুকুও ছিন্ন হইয়া গেল। সংসারের সুখ-সম্পদ, ধনজন, যশোগৌরব সবই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল। কারণ যে একবার বিমল বিধুর শারদ বৈভব ভোগ করিয়াছে, খদ্যোতের ক্ষীণালোক কি তাহার নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারে, না যাহার রসনা একবার অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে সে ঘোল পান করিবার কখনও স্পৃহা রাখে! মহিলতা যেমন মৃত্তিকামধ্যে বাস করিয়াও গায়ে মৃত্তিকা মাখে না—জলের মধ্যে অবস্থান করিলেও যেমন পদ্মপত্রে জল লাগে না, সেইরূপ পাল মহাশয় সংসারে থাকিয়া, সংসারী হইয়াও, তাহাতে সংসক্ত ছিলেন না। পাঁকাল মাছের মত কাদায় নির্লিপ্ত থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সংসারের পঙ্কে কখন তাঁহার আকণ্ঠ নিমগ্ন হওয়া দূরে থাক, গায়ে তাঁহার পাঁকের দাগটি পর্য্যন্ত লাগে নাই।

সাধনমার্গেই বল আর সংসারধর্ম্মেই বল সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি লাভের উপায় নাই। পাল মহাশয় সংসারে অর্থের আরাধনা করেন নাই, কাজেই অর্থও অযাচিতভাবে তাঁহার

করতলগত হয় নাই। যখন সংসারের দেনা পাওনা ফেলিয়া রাখিয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি পার্থিব হিসাবে একরূপ নিস্ব। তাঁহার কিছুই ছিল না, দুলালের জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই— তাই আসন্ন সময়ে, চির বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে স্নেহময়ী জননী পুত্রের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত চলিয়া যাইতেছ, কিন্তু দুলালের কি ব্যবস্থা করিয়া যাইলে? এই অনাথ বালক বাঁচিবে কেমন করিয়া।"

যখন এ কথাটা ভাবিবার বিষয় ছিল, তখন এ বিষয়ে কোন চিন্তাই করেন নাই, এখন অনন্তের পথে পা বাড়াইয়া সে চিন্তা ভাল লাগিবে কেন, তাই একটু বিরক্তির সহিত বলিয়াছিলেন,—"ভাবনা নাই—পাঁচ ভূতে জোগাইবে।"

তাঁহার এই অন্তিম বাণী যে বর্ণে বর্ণে ভবিষ্যতে ফলিয়া গিয়াছে, তাহা দুলালচাঁদের জীবনে বেশ লক্ষিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পাল মহাশয় অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছিলেন দুলালচাঁদ কে, যিনি জগতের লোকের ভাবনার বোঝা মাথায় লইয়া জগতে অবতরণ করিয়াছেন, তাহার ভাবনা তিনি কেন ভাবিতে যাইবেন? তিনি আপনার পথ দেখিয়া লইবেন। তাই বোধ হয় ঐ নির্ম্মলাত্মা সিদ্ধবাক্ মহাপুরুষের মুখ হইতে অন্তীম সময়ে বাহির হইল—"পাঁচ ভূতে যোগাইবে।" পঞ্চ ভৌতিক দেহধারী ধরার নরনারী তাহার সংসারের অভাব দূর করিয়া দিবে।

ফকিরঠাকুর তাহাকে যোগ্যপাত্র জ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার উপরে এই সত্যসনাতন কর্ত্তাভজন ধর্ম্মের গুরুভার অর্পণ করিয়া যান।

স্বপ্রকাশ স্বভাবতঃ স্বয়ং গুরুরূপ।
কল্পিত মানবদেহ প্রকাশ স্বরূপ॥
আপনি আপন তত্ত্ব করিয়া প্রকাশ।
আত্মাকে জীবত্ব ভ্রমে করেন বিনাশ॥

আসন্ন সময় বুঝিয়া পাল মহাশয়কে ডালিমতলায় বাহির করা হইয়াছিল। তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এক সত্য কর সার, ভবনদী হবে পার।" তাঁহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্র, আকাশমার্গ হইতে একটী জ্যোতিঃ আসিয়া তাঁহার অঙ্গে পড়িল; সেই জ্যোতিতেঃ মিশিয়া পাল মহাশয়ের অমরাত্মা অমরলোকে চলিয়া গেল। সকলে দেখিল তাঁহার ভৌতিক দেহ পড়িয়া আছে—তিনি প্রস্থান করিয়াছেন।

তাঁহার জীবিতকালে কিন্তু এ মহৎ ধর্ম্মের প্রকাশ বা বিকাশ লাভ ঘটে নাই। তাঁহার তিরোধানের পর মহাত্মা তুলাল চাঁদের চেষ্টায় কর্ত্তাভজন ধর্ম্ম জগতে প্রচার লাভ করিয়াছিল!

মহাত্মা রামশরণ পালের বাল্য কৈশরের বা তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে লোক পরম্পরায় এবং প্রাচীন কাগজ পত্রে জানা যায় রামশরণ পাল মহাশয়ের পিতারা তুই সহোদর ছিলেন। উহার পিতার নাম শঙ্কর পাল, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ কিঙ্কর পাল। তাঁহাদের

বংশ বরাবরই দেবদ্বিজভক্ত, ধর্ম্মকর্ম্মে আস্থাবন এবং অতিথি-বৎসল। মহাত্মা রামশরণও ঐ সকল গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় উত্তর কালে দৈবানুকূল্য লাভ করিয়া সিদ্ধ মার্গে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

নবম পল্লব।

শ্রীযুত্ দুলালচাঁদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীযুত দুলালচাঁদ অশৈশব মেধাবী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং কুশাগ্রবুদ্ধি। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তাহার অলৌকিক প্রতিভা দর্শনে সকলে বলাবলি করিত মানবের ভাগ্যফলের ন্যায় তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধি তাহার অনুসরণ করিয়া জগতীতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। নচেৎ এত সুকুমার বয়সে এমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, জটিল বিষয়ের মীমাংসায় এমন ক্ষুরধার বুদ্ধি কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

তাহার সপ্তম বর্ষ বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা সতী দেবীর আদর যত্ন এবং স্নেহ ভালবাসায় তাহার বাল্যকৈশোর অতিবাহিত হয়। অবশেষে যৌবনে পদার্পণ করিয়া সংসার ধর্ম্মে মনোনিবেশ করেন এবং পর পর চারিটী বিবাহ হয়।

তাহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়োক্রমকালে কর্ত্তাভজন ধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে সংসারে প্রচারিত হয়। পাল মহাশয় উহার প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তাঁহার আমলে উহা বাহিরে বিকসিত হয় নাই।

মহাত্মা দুলালচাঁদের চেষ্টাতেই উহা সাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময়ে একবার তিনি অগ্রদ্বীপে গোপীনাথের মহোৎসবের বিরাট ব্যাপার দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে অর্থাৎ তাহার আঠার বৎসর বয়সের সময় তিনি ভাবের গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। উহার সুমিষ্ট পদাবলী ভাবমাধুর্য্যপূর্ণ, প্রগাঢ় গৌণার্থযুক্ত এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। স্থানে স্থানে উহার অর্থ এমনই জটিল দুর্জ্জ্যেয় যে তাহার অর্থ করিতে অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিতকেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতে হয়। আবার সাদা কথায়, সামান্য দুই একটী চলিত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বেদ উপনিষদাদি গুরুতর বিষয়ের এমনই মীমাংসা তাহার মধ্যে আছে যে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। প্রত্যুত ভাবের গীত ভাব-সম্পদে অতুল—দুর্জ্জ্যেয়তায় গভীর—ভগবৎ রসে পরিপুষ্ট—জ্ঞানী ভক্তের আত্মপথের সম্বল, অমূল্য অনন্ত উপদেশ-রত্নরাজী খচিত অমূল্য গ্রন্থ।

শ্রীযুত দুলালচাঁদ ঐ সকল গীত রচনা করিয়া তাহার পরমার্থ তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পারিষদবর্গ ঐ সকল সুললিত কণ্ঠে গান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। সেই সময়ে সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বচর রূপে যে সব ভক্তসাধক বা শিষ্য সেবক উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে রামচরণ চট্টোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য, কাশীনাথ বসু, রামানন্দ মজুমদার, নীলকণ্ঠ মজুমদার শেষোক্ত

দুই জন শ্রীযুতের ভাগিনেয়। সঙ্গে ইহারাই সর্ব্বদা পারিষদ ভাবে থাকিতেন।

ক্রমে ক্রমে একে একে, দুইয়ে দুইয়ে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্ম সংসার ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

বহুদিন যাবৎ এইভাবে আনন্দ বিতরণ করিয়া সন ১২৯৬ সালের চৈত্রমাসে মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী যোগে দুলালচাঁদ স্বধামে গমন করিলেন। তাঁহার তিরোধানের পরও বহুদিন যাবৎ সতী মা ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া ছিলেন। বাহ্য দৃষ্টিতে সতী মা বা কর্ত্তা মার সত্ত্বা দৃষ্ট হয় না বটে কিন্তু তাঁহার সমাধির নিকট তাঁহার সত্ত্বা নিত্য বিদ্যমান আছে।

ডালিমতলার মাহাত্ম্য।

কলিতে ডালিম তলা কল্পতরু সত্য,
অশেষ বিশেষ এতে আছয়ে মাহাত্ম্য।
মন খাঁটি করে মাটী মাখে যেই জন,
জটিল কুটিল ব্যাধি করে পলায়ন।
এক মনে এক প্রাণে আসিলে হেথায়,
দুরারোগ্য রোগ হয় আরোগ্য ত্বরায়।
সতী মা উপরে যেবা রাখিবে বিশ্বাস,
সেরে যাবে কুষ্ঠ ব্যাধি হাঁপ সূল কাশ।

কৃপা হলে ভবে তাঁর ঘটে অঘটন,
অন্ধ পায় দৃষ্টিশক্তি বধিরে শ্রবণ।
চিত্ত যেবা রাখে পায় বিত্ত পায় ভবে,
বন্ধ্যানারী পুত্রবতী তাঁহার প্রভাবে।
ডালিম গাছের তলা পবিত্র মহান,
অনন্ত ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ মর্ত্তে সিদ্ধ স্থান।
ফকির দিয়াছে বাণী অক্ষয় মহিমা,
ভবে রবে চিরদিন অনন্ত গরিমা।
মহিমা ঘোষণা হেতু নাম ঘোষপাড়া,
জন্মিবে যে জন বংশে পাবে শক্তিধারা।
সতীমার ভোগ দিতে হবে যার মতি,
সকল বিপদে সেই পাবে অব্যাহতি।
তুমি সত্য এই তত্ত্ব মনে রবে যার,
হোক পঙ্গু পাবে শক্তি গিরি লঙ্ঘিবার!
এই সব কর্ম্ম ভার করিয়া অর্পণ
ফকির করেন শেষে বিদায় গ্রহণ।
ঘোষপাড়া মহাতীর্থ নিত্য দরশন,
ডালিম তলাতে হের জগৎ জীবন।

ঘোষপাড়ার আদি বংশাবলী—

দশম পল্লব।

সতী-মা।

বিধবা সতী-মার পবিত্র হৃদয় ক্রমে পরহিতব্রতে ব্রতী হইয়া উঠিল। দীন-দুঃখী, অনাথ বা শোকার্ত্তকে দেখিলে তাঁহার হৃদয় সমবেদনায় কাতর হইয়া উঠিত; সাধ্যানুসারে তাহাদিগের অভাব দূর করিতে তিনি যত্নবতী হইতেন। কাতর-হৃদয় ব্যক্তির চিত্তে শান্তিদানে তিনি বিরত থাকিতে পারিতেন না; ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। ফল কথা কাঙ্গাল-গরীবের দুঃখ মোচনই তাঁহার নিত্যব্রত হইয়া উঠিল। তাঁহার দয়া, করুণা ও পরহিতৈষণার কথা ক্রমে ক্রমে দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইল।

ক্রমে ক্রমে নানাস্থান হইতে নানাবিধ রোগ-পীড়িত ব্যক্তির সমাগম হইতে লাগিল। সকলেরই আশা সকলেরই ধারণা, সকলেরই বিশ্বাস—সতীমার পদাশ্রিত হইলেই রোগমুক্ত হইয়া পূর্ণকাম হইতে পারিবে। বস্তুতঃ তাহাই হইতে লাগিল। যাহারা উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, সতী-মার চরণ-মূলে উপস্থিত হইবামাত্র, তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে ও করুণ আশীর্ব্বাদে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইয়া যেন দিব্যদেহ ধারণ করিতে থাকিল; করুণাময়ী সতীমার করুণ দৃষ্টিপাতে অন্ধব্যক্তি চক্ষুষ্মান্‌ হইত, বধির শ্রবণশক্তি লাভ করিত, বোবার বোল ফুটিত, বন্ধ্যা নারী দীর্ঘজীবিপুত্রলাভে সুখী হইত—সকলের

সকল কামনাই পূর্ণ হইত। অধিক কি, করুণাময়ী সতী-মাতার করুণ দৃষ্টিপাতে উৎকট গলিতকুষ্ঠী পর্য্যন্ত দিব্যকান্তি লাভ করিতেছে দেখিয়া দিগ্‌দিগন্তের লোক বিস্মিত হইয়া উঠিল। সতীমার মহিমা সম্বন্ধে একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আছে। আমরা এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

একদা এক গর্ভবতী রমণী যথাকালে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল বটে; কিন্তু সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দৃষ্ট হইল, একটি মাংসপিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। অস্থিহীন—অলাবুর আকৃতি মাত্র। শিশুটির আকৃতি মানুষের ন্যায় বটে, কিন্তু মাংসপিণ্ড মাত্র। সেই পিণ্ডাকার শিশুটিকে লইয়া তাহার জননী সতীমার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার চরণতলে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "মা আমার দুর্ভাগ্যে এই মাংসপিণ্ড ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। এই 'বাঁকা' শিশু রাখিয়া আমার ফল কি। আপনি ইচ্ছাময়ী আপনার চরণতলে ইহাকে ফেলিয়া দিলাম, আপনি ইহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করুন।"

সতীমা বলিলেন, "তবে এ শিশু কাহার?"

"এ বাঁকা আপনারই সন্তান, ইহার ভাগ্যবিধাত্রী আপনিই। ইহাকে লইয়া আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। এই অভাগা শিশুকে লইয়া অভাগিনীর কোন ফল নাই।"

"তবে তুই বাড়ী চলিয়া যা। শিশু যদি আমারই হইল, তবে আমার কাছেই থাকুক, ইহাকে লইয়া আমার যাহা ইচ্ছা হয় করিব।"

সতীমার কথা শুনিয়া প্রসূতি একাকিনা নিজগৃহে প্রস্থান করিল। তখন সতীমা পবিত্র দাড়িম্বতলার পবিত্র ধূলি লইয়া শিশুটির সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বাঁকা, তুই আমারই সন্তান-স্বরূপ হইলি, তবে আর মাংসপিণ্ডাকারে এ ভাবে রহিয়াছিস্ কেন? শীঘ্র গাত্রোত্থান কর্, আনন্দে বেড়াইয়া বেড়া।"

যেমন আদেশ, অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত। সতীমার আদেশমাত্র শিশু যেন দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল; অমনি হামাগুড়ি দিয়া চলিতে ফিরিতে লাগিল; সর্ব্বাঙ্গে যেন অস্থি-সঞ্চার হইল; খিল্‌খিল্ করিয়া মধুর হাসিতে প্রাঙ্গণ পুলকিত করিয়া তুলিল। দিন দিন শিশু চন্দ্রকলার মত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে এক বর্ষ, দুই বর্ষ, ক্রমে দ্বাদশ বৎসর কালস্রোতে ভাসিয়া গেল। বাঁকা এখন দ্বাদশবর্ষীয় সুন্দর বালক। এই সময়ে তাহার প্রসূতি ইহধাম হইতে প্রস্থান করিল।

সতীমার গৃহে দুইটি কপিলা গাভী ছিল। মাতৃ-আদেশে বাঁকা সেই গাভী দুইটির রক্ষণাবেক্ষণ করিত। তাহাদিগকে গোঠে লইয়া যাওয়া, তত্ত্বাবধান করা, সন্ধ্যাকালে ফিরাইয়া গৃহে আনা—সমস্তই বাঁকাকে করিতে হইত। গোপালনে বা গোচারণে তাহার বিন্দুমাত্র অলস্য বা অমনোযোগ ছিল না।

একদা বাঁকা কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। সতীমা অনেক অনুসন্ধান করিলেন, তাঁহার স্নেহার্দ্র

হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; চিন্তায় চিন্তায় সে রজনী অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রত্যূষে বাঁকা আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দর্শনমাত্র স্নেহমিশ্রিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে সতীমা বলিলেন, "হাঁ রে বাঁকা, তুই কল্য হইতে এ যাবৎ কোথায় ছিলি ? কোথায় গিয়াছিলি ? আমি সমস্ত রাত্রি তোর ভাবনায় অস্থির। তুই যখন এরূপ অবাধ্য হইয়াছিস্, তখন আর তুই এ গৃহে থাকিবার উপযুক্ত নহিস্। যা—চলিয়া যা, যেখানে তোর প্রাণ চায় যা, আমার এখানে আর তোর স্থান নাই।"

দেবীর তিরস্কারে বাঁকা একটিমাত্রও উত্তর করিল না ; কিয়ৎক্ষণ অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া ধীরে ধীরে রথতলার নিকট একটি বৃক্ষমূলে গিয়া শয়ন করিল। যেমন শয়ন, অমনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সে দিন আর তাহার উদরে অন্ন প্রবেশ করিল না।

বেলা যখন অপরাহ্ণ, অনুমান চারি ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন বাঁকার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গাত্রোত্থান করিয়া বসিয়া বসিয়া সে কি চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার পূর্ব্বলক্ষণ উপস্থিত। তখন বাঁকা উঠিয়া ধীরপদে বনের দিকে চলিল। সতীমা দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অনতি উচ্চস্বরে বলিলেন, "বাঁকা, কোথায় যাইতেছিস্" ? অধোবদনে থাকিয়াই বাঁকা উত্তর করিল, "গরু আনিতে যাইতেছি।" মা বলিলেন, "গরু আপনিই আসিবে, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আর তোকে বনের দিকে যাইতে হইবে না। জানিস্ ত, এ সময় বাঘের ভয়। ফিরিয়া আয়।"

মাতার নিষেধবাক্যও বাঁকার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে গরু আনিতে বনের অভিমুখেই চলিল। কিছু দূর গিয়াই দেখিল, গাভী আপনিই গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছে। বাঁকা গাভীর গাত্রে ও মস্তকে হাত বুলাইয়া, আদর করিয়া সঙ্গে লইয়া বাটীর দিকে ফিরিয়া আসিল। সে যেমন দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াছে, অমনি এক বিকটাকার দীর্ঘদেহ ব্যাঘ্র তাহার সম্মুখে উপস্থিত। গাভী ভয়বিহ্বল হইয়া হাম্বা-রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। বাঘ গাভীর দিকে ভ্রূক্ষেপ ন করিয়া বাঁকাকে লক্ষ্য করিয়াই আক্রমণে উদ্যত হইল।

তখন বাঁকা মৃদুহাস্য করিয়া বাঘের দিকে কটাক্ষপাত পূর্ব্বক বলিল, "রে ব্যাঘ্র! কেন এত বৃথা আস্ফালন করিতে-ছিস্? তোরে ভয় করা দূরে থাকুক, আমি তোরে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করি। তুই জানিস্ আমি কে? যাঁর পবিত্র নামে ঘোরতর ভবভয় দূর হয়, যাঁর পবিত্র চরণতরী আশ্রয় করিয়া লোকে অন্তিমে সংসারসাগর সুখে পার হইয়া যায়, সেই সতীমা আমার জননী। আমি তাঁহার চরণের দাস—অনুগত পুত্র।"

বাঁকা যেমন এই কথা বলিয়া ব্যাঘ্রের দিকে রোষকষায়িত-লোচনে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি সেই ঘোররূপী ব্যাঘ্র যেন নিশ্চলপ্রায় হইয়া ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে প্রস্থান করিল; নিমেষমধ্যে বনগর্ভে কোথায় অন্তর্হিত হইল, আর দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। বাঁকাও প্রফুল্লচিত্তে গাভীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং মাতৃপদে আমূল সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সতী

মাতা তখন তাহার গাত্রে হস্তার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাঁকার ভক্তিদর্শনে তাঁহারও নয়ন কমলে বাৎসল্যবশে স্নেহাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

ভক্তিই মুক্তির কারণ ; ভক্তিই পূর্ণসুখের নিদান ; ভক্তিই ইষ্টপাদপদ্মলাভের একমাত্র সোপান। মন অটল হইলে, ভক্তি অচলা থাকিলে, সেই সাধু পুরুষই সতীমাতার মহিমা বুঝিতে সমর্থ হয় !

সতীমার অলৌকিক লীলার পূর্ণবর্ণনা এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভবে না। প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানে আর একটি মহিমার বিষয় পাঠক-বর্গকে—ভক্তবৃন্দকে উপহার দিলাম।

সতীমা প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিজ ভবনস্থ প্রসিদ্ধ পবিত্র দাড়িম্বতলায় একবার করিয়া উপস্থিত হইতেন। ঐ স্থানটি রথতলার নিকটবর্ত্তী। একদা প্রত্যূষে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন অদূরে একটি গাভী ভূপতিত রহিয়াছে। দূর হইতে গাভীটিকে মৃতাবস্থ বলিয়াই বোধ হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সতীমাতা ধীরপদবিক্ষেপে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গাভীটি সদ্যঃপ্রসূতা ; নবজাত বৎসটি তাহার অঙ্কদেশেই পতিত আছে বটে, কিন্তু গাভীটির জীব-লীলার অবসান হইয়াছে। বৎসটির দিকে দৃষ্টিপাত হইবামাত্র স্নেহরসে জননীর হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায় ! গাভীটির অবর্ত্তমানে এই সদ্যোজাত বৎসটির কি উপায় হইবে ? দুগ্ধের অভাবে কিরূপে ইহার শৈশব জীবন সুরক্ষিত হইবে ? ভগবন্ ! তোমার নাম দয়াময় !

এই বৎসটির জীবন রক্ষিত না হইলে তোমার দয়াময় নামে কলঙ্ক রটিবে! না, তাহা হইবে না, বৎসটির প্রাণরক্ষা আবশ্যক; সুতরাং গাভীটিকেও জীবিত থাকিতে হইবে।

মনে মনে স্নেহ-কাতর হৃদয়ে এইরূপ আলোচনা করিয়া জননী সেই মৃতা গাভীটিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "অয়ি অবলে সুরভি! তুমি কেন এ ভাবে অচেতন হইয়া ভূশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তোমার অবর্ত্তমানে তোমার স্নেহের ধন বৎসটির কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহা কি একবারও স্মরণ করিতেছ না? এ ভাবে পড়িয়া থাকা তোমার উচিত নহে। তুমি গাত্রোত্থান কর, এখনও তোমাকে কিছুদিন জীবিত থাকিতে হইবে, তোমাকে দুগ্ধ দান করিয়া এই বৎসের জীবন রক্ষা করিতে হইবে। আর নিশ্চেষ্ট থাকিও না।"

অহো! পুণ্যময়ীর পুণ্যবাণীর কি সুপরিনাম! দেবীর মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত করুণাবাণী শ্রবণমাত্র গাভিটি তৎক্ষনাৎ পুনর্জ্জীবনলাভ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৎসের গাত্রলেহন করিতে লাগিল। বৎসটিও আনন্দভরে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধ-পুচ্ছে মাতৃস্তন্য পান করিতে আরম্ভ করিল। সতীমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি সবৎসা ধেনুটিকে লইয়া ধীরে ধীরে নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গাভীটি কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারে না গিয়া কাঁচড়াপাড়ার অভিমুখে ছুটিল, বৎসটিও তাহার জননীর অনুসরণ করিল। সতীমাতা বুঝিলেন গাভীটি যাঁহার পালিত, তাঁহার বাটীর দিকেই সে সানন্দে ছুটিয়াছে।

ইত্যবসরে এক কৃষক কার্য্যোপলক্ষে সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল। গাভীটি যাঁহার পালিত, কৃষক তাঁহাকে চিনিত এবং গাভীটিও তাহার অপরিচিত ছিল না! গাভীকে ছুটিতে দেখিয়া সে বলিল, "মা! ঐ গাভীটি কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী একটী ব্রাহ্মণের জানিবেন; আমি তাঁহাকে চিনি; এ গাভী-টিকেও আমি কতবার তাঁহার বাটীতেই দেখিয়াছি।

কৃষকেন বাক্যে সতীমার হৃদয় সম্যক্‌রূপে আশ্বস্ত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, গাভীটি যাঁহার পালিত, সে তাঁহারই বাটীতে উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। তখন তিনি সুস্থচিত্তে নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

গাভীটি যাঁহার পালিত, উপরি-উক্ত কৃষকের মুখে আনু-পূর্ব্বিক সকল ঘটনা শ্রবণ করিয়া তিনি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইলেন। ভক্তিরসে তাঁহার হৃদয়ভূমি অপ্লাবিত হইল। আর কালবিলম্ব না করিয়া, পরদিন, প্রত্যুষেই সবৎসা ধেনুটিকে লইয়া তিনি সতীমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গাভীটী তাঁহার পদে উপহার দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

ক্রমে চারিদিকে সতীমার মহিমা বিঘোষিত হইল। দলে দলে ভক্ত আসিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত হইল; সঙ্কটে, বিপদে, আপদে সকলেই মাকে একমাত্র কাণ্ডারী বোধে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

একাদশ পল্লব।

জগতের মঙ্গলসাধনোদ্দেশেই অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পাপের অনুষ্ঠান দূরীকরণের জন্যই ভগবান্ বা ভগবতী জগতে মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। স্থান-ভেদে, কালভেদে, ও ব্যক্তিভেদে কোন কোন সময়ে কোন মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়া পাপাচারীকে পুণ্যপথে প্রবর্ত্তিত করেন। ইহার দৃষ্টান্ত পুরাকালের রত্নাকর। যে রত্নাকর দস্যুবৃত্তি করিয়া—লোকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া, অধিক কি, জীবের জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, সেই আজন্মদস্যু রত্নাকরও ভগবৎ-প্রেরিত নারদের উপদেশে মহা-পুরুষরূপে পরিগণিত হইয়া 'বাল্মীকি' নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল।

আমরা যে সময়ের ঘটনা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন লর্ড হেষ্টিংস ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনেরেল। সে সময় এ দেশ দস্যু তস্করের লীলাভূমি ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দস্যুভয়ে অধিবাসিগণ সর্ব্বদা ভয়-বিত্রস্ত হইয়া বাস করিত। রাত্রির কথা দূরে থাকুক, দিবাভাগেও লোকে দলবদ্ধ না হইয়া এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতে পারিত না বা সাহসী হইত না। হেষ্টিংস এইরূপ অরাজকতা দর্শনে শান্তিস্থাপনের মানসে দস্যুদমনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনগুণে দস্যুগণ ক্রমে ক্রমে ভীত ও নিরুদ্যম হইয়া উঠিল।

একদা কতকগুলি দস্যু কোন স্থানে ডাকাতী করিবার উদ্দেশে দলবদ্ধ হইয়া পরামর্শ করিল, সতীমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক উদ্দিষ্ট কার্য্যে যাত্রা করিবে। তাহা হইলে আর তাহাদিগকে কোনরূপ বিপদে পতিত হইতে হইবে না; অভীপ্সিত কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। সতীমার অলৌকিকী লীলাসমূহ দেখিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সেই দেবীর আশীর্ব্বাদ অখণ্ডনীয়। এই বিশ্বাস—এই ধারণা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহারা সতীমার নিকট উপস্থিত হইল। সতীমার পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তাহারা কহিল, "মা! আপনার আদেশে সকলেরই মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে; তাই আমরা আপনার পদমূলে শরণ গ্রহণ করিলাম। অশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যে কার্য্য-সাধনের উদ্দেশে যাত্রা করিতেছি, তাহাতে যেন কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, আমরা যেন ইষ্টসিদ্ধি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারি।"

যিনি অন্তর্যামী ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের ঘটনা যাঁহার হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত, কোন বিষয়ই তাঁহার অগোচর থাকে না। দস্যুদিগকে দেখিবামাত্র, অধিকন্তু তাহাদের বাক্য শ্রবণমাত্র সতীমাতা বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারা দস্যু। দস্যু-বৃত্তিতে কৃতকার্য্য হওয়াই ইহাদের উদ্দেশ্য। ইহা জানিয়াও তিনি তাহাদিগকে হাস্যমুখে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "যাও, তোমরা সুখে প্রস্থান কর, তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, আমার আশীর্ব্বাদে তোমাদের পদে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইবে না।"

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যিনি পাপের নিরাকরণ করিয়া জগতে পুণ্য-সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, দস্যুদিগের দস্যুবৃত্তিসাধনে প্রশ্রয় দিয়া তিনি সেই পাপের ভার বৃদ্ধি করিলেন কেন? ইহার উত্তর—ইহাও তাঁহার অলৌকিকী লীলা। জীব যে পথে চিরদিন চালিত হয়, যে পথে চিরদিন অভ্যস্ত থাকে, হঠাৎ সহসা তাহাকে একেবারে সে পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে গেলে সুফলের কিছুমাত্র আশা নাই! শনৈঃ শনৈঃ সোপানে সোপানে আরোহণ করাইয়া তাহাকে অভীষ্ট সুপথে লইয়া যাইতে হয়। মঙ্গলময়ীর মঙ্গল উদ্দেশ্যই এইরূপ।

যাহা হউক, দস্যুগণ সতীমাতার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া যাত্রা করিল। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, সে যাত্রায় তাহারা বিস্তর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া সানন্দ-হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সতীমাতার চরণে তাহাদিগের ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হইল; তাঁহার চরণে তাহাদিগের ঐকান্তিকী আসক্তি জন্মিল।

অধর্ম্মসঞ্চিত অর্থ চিরস্থায়ী হয় না। চিরস্থায়ী কেন, গজভুক্ত কপিত্থবৎ অতি অল্পকালের মধ্যেই কোথায় কি ভাবে তাহা অন্তর্হিত হয়, নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। দস্যুদিগেরও তাহাই হইল। তাহারা যে অর্থরাশি সঞ্চিত করিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল; পুনরায় তাহাদের দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। তখন আবার তাহারা দস্যুবৃত্তির অভিলাষে দলবদ্ধ হইয়া সতীমাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেবী বলিলেন, "আমি এবার আর পূর্ব্বের মত আশীর্ব্বাদ বা অনুমতি দিতে পারি না। যদি তোরা আমার কথা রক্ষা করিস্, আমি যাহা বলিব, দ্বিরুক্তি না করিয়া সেইরূপ কার্য্য করিস্ তাহা হইলে আমি আশীর্ব্বাদ করিতে পারি।"

দস্যুগণ করযোড়ে বলিল, "জননি! আমরা আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না; আপনার চরণাশীর্ব্বাদই আমাদিগের একান্ত ভরসা। আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, অবিচারিতচিত্তে তাহাই আমরা পালন করিব।"

দেবী কহিলেন, "সত্যধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম জগতে আর কিছু নাই; সত্যমন্ত্র অপেক্ষা পরম পূত মন্ত্র ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই লক্ষিত হয় না। তোরা সেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই ধর্ম্মের অনুসরণ কর্। সর্ব্বপ্রকারে তোদের মঙ্গললাভ হইবে।

দস্যুগণ কহিল, "দেবি! আমরা আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। অনুমতি করুন্, আমাদিগকে কি করিতে হইবে।"

দেবী কহিলেন, "এই যে সম্মুখে 'হিমসাগর' নামক পুষ্করিণী দেখিতেছিস্, ইহার তুল্য পুণ্যপ্রদ জলাশয় অতি বিরল; যাবতীয় পুণ্যতীর্থই ইহার অভ্যন্তরে নিহিত। এই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া আমার নিকট সত্যমন্ত্র ও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর্; তৎপরে অভীষ্ট কার্য্যে অভীষ্ট স্থানে যাত্রা করিলেই মনোরথ পুর্ণ হইবে।"

আদেশমাত্র দস্যুগণ হিমসাগরে স্নান করিয়া উত্থিত হইলে, সতীমাতা একে একে সকলকে সত্যমন্ত্রে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত

করিলেন। তখন যেন দস্যুদিগের অন্তর-মন্দির দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; পূর্ণ সত্ত্বগুণে বিমণ্ডিত হওয়াতে হৃদয় কমল যেন চিদানন্দে পূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে তাহা-দিগের রুচির ও মতির পরিবর্ত্তন ঘটিল; জগৎসংসার অসার বোধ হইতে লাগিল। হৃদয়ে বৈরাগ্যভাবের সঞ্চার হইল।

তখন তাহারা দেবীপদে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া করযোড়ে কহিল, "মা! জানি না, জন্মজন্মান্তরে আমরা কত পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আজ আপনার কৃপালাভ করিলাম। আমাদের হৃদয় এতদিন দুরপনেয় মলে পরিপূর্ণ ছিল, আজ আপনার প্রসাদ জলে তাহা বিধৌত হইল। আর আমাদিগের দস্যুবৃত্তিতে কামনা নাই; অজ্ঞানান্ধ থাকিয়া আমরা দুস্তর দুরপনেয় পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আপনি আমাদিগের পূর্ব্বকৃত সেই সকল অপরাধ ক্ষমা করুন।"

দেবী কহিলেন, "বৎসগণ! আর তোদের কোন আশঙ্কা নাই, আর তোরা কলিকৃত পাপজালে বিজড়িত হইবি না; এখন তোরা 'ভাবের গীতে চিত্তনিবেশ করিয়া সুখে ধরাধামে নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত কর্; পরিণামে যথাকালে পরমধামে প্রস্থান করিবি।"

তখন সেই দস্যুগণ দুলালচাঁদের রচিত 'ভাবের গীতে' চিত্তনিবেশ করিল, সেই আনন্দগীতের অমিয় ধারায় সমগ্র দেশ ভাসাইয়া দিল; পাপতাপের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল, সতীমার পবিত্র নামে ডঙ্কা বাজাইয়া আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিল।

দ্বাদশ পল্লব।

দোল-পুর্ণিমার দিন সতীমার বা দুলালচাঁদের পবিত্র ভবন পুর্ণানন্দে আনন্দময় হয়। নানা দিগ্‌দেশ হইতে সহস্র সহস্র ভক্তের ও দর্শকবৃন্দের সমাগম হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত এ আনন্দের উপলব্ধি করা অন্যের সাধ্যাতীত। আজ সেই আনন্দের দোল-পুর্ণিমা। আজ সতীমাতার ভবন যেন পূর্ণ আনন্দময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে? আবীরের ছটায়—আবীরের ঘটায় চারিদিক অরুণ আভায় বিমণ্ডিত।

দেবীর লীলাপ্রকাশে দেবতারাই সহায় হইলেন। অকস্মাৎ ঘোর ঘটা করিয়া আকাশমণ্ডল কৃষ্ণমেঘে আচ্ছাদিত হইল, পৃথিবী যেন অন্ধতমসায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, ঘন ঘন বিজলী চমকিতে লাগিল। প্রবলবেগে বায়ু প্রবহমান হইয়া তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করিল। বৃষ্টি আসিবার আর বিলম্ব নাই।

আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া কতিপয় 'মহাশয়' পরিত্রাণ লাভের আশায় সতীমাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয়-নম্র ও ভীত স্বরে কহিলেন, "মা! যেরূপ পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, অবিলম্বেই ঘোরতর বৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। তোমার এই ভক্ত সন্তানগণের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। অসংখ্য ভক্তের সমাগম হইয়াছে, ইহারা কোথায় দাঁড়াইবে?"

সতীমার বদনকমল মৃদুহাস্যে সুশোভিত হইল। মধুর বচনে মধুর সম্বোধনে তিনি কহিলেন, "বাছা সকল, তোমাদের কোন চিন্তা নাই। মালিক ভক্তের চিরসঙ্গী; ভক্তের ক্লেশ-নিবারণে তিনি সদাই সচেষ্ট; তিনিই ইহার সুবিহিত করিবেন। আমার এই পুরীর মধ্যে যতদূর স্থান ব্যাপিয়া যাত্রীর সমাগম হইয়াছে, তৎপরিমিত স্থানের মধ্যে বিন্দুমাত্রও বারিবর্ষণের আশঙ্কা নাই, বরং অল্প অল্প পরিমাণে চন্দনবৃষ্টি হইয়া চারিদিক সুগন্ধে মাতাইয়া তুলিবে। তোমাদের কোন চিন্তা নাই। তোমরা আপন আপন 'কাফলায়' গমন করিয়া আনন্দে আত্ম-কার্য্য সম্পাদন কর।"

সতীমার বাক্যে কাহারই অনাস্থা বা অবিশ্বাস নাই, সকলেই আশ্বস্ত হইয়া নিজ নিজ কাফলায় গমন করিলেন এবং যাবতীয় ভক্তগণের নিকট সতীমাতার অভয়বাণী জানাইলে সকলেই নিরুদ্বেগে স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল। বস্তুতঃ জননীর বাক্যই সত্য হইল। অবিলম্বে মুষলধারে ঝড় বৃষ্টি আসিল বটে, কিন্তু পুরীর মধ্যে কিছুমাত্রও জলবর্ষণ হইল না, তৎপরিবর্ত্তে মৃদুমধুর চন্দনবৃষ্টি হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিল ভক্তগণের প্রাণ আনন্দহিল্লোলে মাতিয়া উঠিল—'জয় সতীমার জয়! জয় দুলালচাঁদের জয় রবে চারিদিক্ মুখরিত হইল।

আদি বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ।

সহজ ধর্ম্ম কি।

সহজ ধর্ম্ম কি? সত্যধর্ম্ম। সত্যধর্ম্ম কাহাকে বলে? যাহাতে দ্বৈতজ্ঞান নাহি, অর্থাৎ 'সকলেই এক কৃপাময় পরম পুরুষের ভক্ত ও আজ্ঞাবহ সেবক' এইরূপ জ্ঞান করত, দুই, চারি, দশ, বিশ, শত, সহস্র ধর্ম্মাত্মা একত্র মিলিত হইয়া উপাসনা করিতে যে ধর্ম্মে শিক্ষা দেয়, অথচ কোনও ধর্ম্মেই বিদ্বেষ ভাব জন্মায় না, বা তাহা মিথ্যা এ ধারণাও করিয়া দেন না তাহাই সত্যধর্ম্ম।

ব্যবহার ও পরমাত্ম এ উভয়ই সত্য; তবে ব্যবহার ও পরমাত্মে বিশেষ এই, একটী যেন ঘরের ভিতর আর একটী যেন তাহার বাহির। সহজ মানুষের বাক্য, "ব্যবহার ও পরমাত্ম কেমন, যেমন অন্তর্ব্বাহ্য। ব্যবহার ও পরমার্থ, এই দুইমতেই জগৎ চলিতেছে; তবে কোনও মতে ব্যবহারকে সত্য বোধ করিয়া, ও পরমাত্মকে মিথ্যা ভাবিয়া, একমাত্র ব্যবহারকেই বলবৎ জ্ঞান করত, তাহাই সত্য বলিয়া মানিতেছেন, আবার কোনও মতে বা ব্যবহার মিথ্যা পরমাত্ম সত্যজ্ঞান করিয়া, সেই পরমাত্মমতেই চলিতেছেন। "যাহাদিগের মতে একটা সত্য, অন্যটা মিথ্যা তাহাদিগের দুই মিথ্যা, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাহি। যেহেতু উভয় সত্য, অর্থাৎ অন্তবাহ্য সত্য ব্যতিরেকে সত্য হয় না, এবং কদাপি হইতে পারেও না।"

ব্যবহার ও পরমাত্ম কাহাকে বলে ?

ব্যবহার বলিতে, মনুষ্যগণ, হিন্দু মুসলমান, ম্লেচ্ছ বা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সূদ্র ইত্যাকার নানা জাতি ও বর্ণে বিভক্ত হওত সমাজ-বদ্ধ হইবার ঠিক পর হইতেই, যে এক সামাজিক নিয়ম বা লোকাচার এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে, (অর্থাৎ ইনি ব্রাহ্মণ স্থতরাং ইনি অপরাপর সকলের পূজ্য ও প্রণম্য, এবং ইনি সূদ্র, স্থতরাং ব্রাহ্মণের সেবক) তাহাই বুঝায় ; এবং পরমাত্ম বলিতে, কেবল পরমপুরুষের মহান্ নীতি প্রকাশ পায়, অর্থাৎ সকলেই যখন এক পরম পিতার সন্তান, তখন উচ্চ নিম্ন ইহার মধ্যে কেহই হইতে পারে না, এই প্রকার জানাইয়া দেন।

সত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ফকিরঠাকুর ঘোষপাড়ার সম্প্রদায়কে ব্যবহার ও পরমাত্ম এই উভয় মতেই চালিত করিয়াছিলেন। ব্যবহার মতে জাতিতে তাহারা হিন্দু এবং বর্ণে শূদ্র (সৎগোপ), সে মতে তাহারা দোল, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপূজা, মনসা-পূজা এবং ষষ্ঠী-পূজা এতৎসমুদয়ই করিয়া থাকেন, কোনও রীতি-পদ্ধতিরই অপ্রচলন কখনও নাই ;—গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও স্বজাতি এ সকলেরই যথাযথ আবাহন, ও বন্দনাদি সর্ব্ব কৌলিক ও লৌকিক কার্য্যেই আছে ; আবার পরমাত্ম মতে * সময়ে সময়ে ত্রিশ বত্রিশ হাজার লোক সকলে একত্র

* "সত্য-আচার" ইহারই অপর নাম।

মিলিত হইয়া অভেদভাবে পরস্পর প্রেম করিয়া থাকেন ; এবং ব্যবহারিক উত্তমে অধমে সমতাভাবে পরস্পর নির্ম্মল সত্য একজাতি প্রাপ্ত হইয়া, সত্যপরমাত্ম বোধে দ্বৈতরহিত হওত, গুরুপ্রদত্ত পথে অগ্রসর হইয়া, যে প্রকার গঙ্গাজলের কলস ও দধি কলস একত্র করিলে, সেই কলসী, দধি ও গঙ্গা একত্র মিলিত হয়, সেই প্রকার এই বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে যে মহান্ লক্ষ্য এক, সেই এক মহান্ পুরুষোত্তমকে সকলের প্রাণজ্ঞান করত, সর্ব্বজাতিতে এক সাধারণ আপন বস্তু ধরাইয়া, মহানন্দ উপভোগ করেন। রাগ, দ্বেষ, হিংসারহিত ব্যবহারে ঘোষপাড়া গোস্বামীর শিষ্য ; আবার মন্ত্রউপাসক গৃহীগতে দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজাও হইয়া থাকে, তবে তাহাতে বলি নাই—সাত্ত্বিকমতে পূজা, মদ্যমাংস একেবারেই নিষিদ্ধ।

ব্যবহার এবং পরমাত্ম এই উভয় সত্যমতে চালিত হইলে, গৃহস্থ-ধর্ম্মই প্রধান বলিতে হইবে ; উদাসীনের ধর্ম্ম, ধর্ম্মই নহে, কেননা ফকিরি হইলে একপক্ষ অবশ্য হইতে পারে, কিন্তু গৃহে থাকিয়া ফকিরি এবং গৃহস্থালী উভয়ই অনায়াসে সাধিতে পারা যায়। এই প্রকারের গৃহস্থকে ফকির-গৃহস্থ কহে ; মায়াবী গৃহস্থ কহিতে পারা যায় না। মায়াবী গৃহস্থ কহে, ঐ সকল ব্যক্তিকে, যাঁহারা কেবল গৃহস্থালীতেই রত।

গৃহস্থ ব্যক্তিকে আহার-ব্যবহারের জন্য সংসার নির্ব্বাহার্থে তণ্ডুল বা বস্ত্রাদির যখন আবশ্যকতা হয়, তখন দেশাচারের বশবর্ত্তী হওত, অন্য কোন না কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হইয়া থাকে ; এবং এই কারণেই, তাঁহাদিগের

কেহ বা কখনও মহাজন, আর কেহ বা কখনও খরিদ্দাররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অর্থই এই মহাজনী খরিদ্দারির একমাত্র চালক, অর্থাৎ মনুষ্যের যাহা কিছু আবশ্যক দ্রব্য, তাহা তাহাদিগকে একমাত্র অর্থ দিয়াই সর্ব্বকাল সংগ্রহ করিতে হইয়া থাকে। আবার অর্থ কিছু সর্ব্বদাই সকল মনুষ্যের হস্তে থাকে না; সুতরাং এ ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে ঋণগ্রহণ না করিলে, কিছুতেই তাহাদিগের অভাব পূরণ হইয়া থাকে না, আর তাহাই তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হওত এই দারুণ ঋণভার আপনাপন স্কন্ধে লইয়া থাকে। তবে কতদিনে যে, এই ঋণ তাহারা পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে, অথবা একেবারেই হইবে কিনা, ইহা পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখা, অবশ্যই তাহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম। যাহার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নাহি, সে যেন ভ্রমেও কখন ঋণগ্রহণ না করে, কেননা, তাহা হইলে, মিথ্যা-কথনের কারণে সত্যের অপলাপের চেষ্টা করা হইবে, যাহার ফলে তাহার সত্যধর্ম্ম একবারেই সংরক্ষিত হইবে না। আবার যেখানে ব্যবহার, সেখানে যেমন প্রায়ই পরমাত্ম থাকে না, তেমনি পরমাত্ম যেখানে, সেখানেও ব্যবহার প্রায়ই থাকিতে পায় না, অতএব পরমাত্মের আত্মীয়তা যে স্থলে, সে স্থলে কর্জ্জ কদাপি লইবে না, বা দিবে না। সত্য যাহাতে অক্ষত (বজায়) থাকে, প্রাণপণে সে চেষ্টা করিবেক, তাহা হইলেই সত্যধর্ম্ম তোমাতে বর্ত্তিবে এবং তুমি একজন সত্যবাদী ভগবৎজন হইবে; নতুবা মহা এক ভণ্ড, পাষণ্ড, মাংসপিণ্ড ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে।

কর্ত্তাভজন।*

কর্ত্তাভজন কি ধর্ম্ম? সত্যধর্ম্ম। সত্যধর্ম্ম কাহাকে বলে? হিন্দু, যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি ধর্ম্মেতে আপন আপন ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া, আপন ইষ্টতে যে নিষ্ঠা করিয়া চলিতেছেন ও বলিতে-ছেন; সত্যধর্ম্ম তাহা বা তদ্রূপ নহে। ইহার নাম মূল সত্য, যাহার আদেশে এ সকল ও অন্যান্য পন্থা সত্যবোধ হইতেছে। কালী, কৃষ্ণ, রাম, রহিম, আল্লা, খোদা, যিশু ইত্যাদি উপাধি-বিশিষ্ট সত্য, অর্থাৎ কালী সত্য, কৃষ্ণ সত্য, আল্লা সত্য, যিশু সত্য; এই সকল উপাধিবিশিষ্ট সত্যকে মূল সত্য বলি না। মূল সত্য অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্য, নিত্য-সত্য। সত্যই তাহার উপাধি; তাহাতে অন্য উপাধি নাই। সত্য ভিন্ন অন্য উপাধির নাম কুহক অর্থাৎ ইন্দ্রজাল বা ভেল্কি! তবেই যে পর্য্যন্ত সত্য ভিন্ন অন্য উপাধিযুক্ত, সে সকল কুহক—ঊর্দ্ধমূল নহে। যেমন বৃক্ষের শাখা পল্লব, সেই বৃক্ষ ছাড়া বস্তু নহে, কিন্তু এক মূলের শক্তিতে সকলের শক্তি, অতএব সেই মূলে জলসেচন না করিয়া শাখাতে জল সেচন করিলে, বৃক্ষের পুষ্টি হয় না। তেমনি হিন্দু, যবন, ম্লেচ্ছাদি যত জাতি আছেন ইহারা এক এক শাখা, তাহার মহাবৃক্ষ মূল সত্য, এই মহাবৃক্ষের এক এক শাখা বা ডালকে এক এক জাতি এক এক মতে মানিতে-ছেন সুতরাং মূল সত্যের অধিকারী কেহই যে হইবে না,

* সাধন-ভজনের নিয়ম এই কর্ত্তাভজনেতেই দৃষ্ট হইবে

ইহা নিশ্চিত। একডালের ব্যক্তি, অন্য ডালকে মানেন না, পরস্পর সর্ব্বদা কেবল বিরোধে প্রবৃত্ত। হিন্দুরা বলিতেছেন, "ন নীচ যবনাৎপরা" অর্থাৎ যবনের বাড়া আর নীচ নাই; আবার যবনেরা বলেন, "হিন্দুর বাড়া কাফের আর নাই;" ম্লেচ্ছরাও বলিতে ছাড়েন না যে, "হিন্দু যবন ইহাদের কাহারও ধর্ম্মই ধর্ম্ম নহে, কেবল আমাদিগের ধর্ম্মই ধর্ম্ম।" এমনি পরস্পরই কহিয়া থাকেন। এস্থলে কাহার ধর্ম্ম যে সত্য, আর কাহার যে মিথ্যা, নিশ্চয় হওয়াই ভার। শাখায় শাখায় বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় মূলের অন্বেষণ কোনমতেই হয় না। যিনি সকলের মূল, তিনি সর্ব্বকর্ত্তা; তাঁহার ভজনের নামই কর্ত্তাভজন। এই উপাসনা করিলে সকলের উপাসনাই করা হইল; আলাহিদা কাহারও উপাসনা করিতে হয় না। যে মূলে জল দিলে শাখাপল্লব সকলে পুষ্ট থাকেন, এ সেই মূল। সত্যমতের বিচারে সমস্ত সত্য। সত্য মূল হইতে স্থূল বৃক্ষ উৎপন্ন। তাহার শাখা প্রশাখা সমস্তই সত্যমূলক সত্য, অর্থাৎ জগতীয় সত্য। মিথ্যা অতীত যে সত্য, তাহাকেই মূলসত্য বলি।

জাতীয় সত্য মিথ্যার অর্থ এই যে, ভ্রমপ্রযুক্ত আপনাকে না জানিয়া অন্যেতে আমি বোধ করিয়া, আপনি যে কি তাহা না জানিয়া, ভ্রমান্ধ অহং বুদ্ধিতে যে সকল সত্য মিথ্যা বলেন, সে সত্যও মিথ্যা, মিথ্যাও মিথ্যা। যেমন ক্ষিপ্তব্যক্তির মুখের বাক্য সমস্তই মিথ্যা, তদ্রূপ জগতীয় জীবসকল যে সত্য মিথ্যা কহিতেছেন, তাহারই নাম জগতীয় সত্য মিথ্যা। এই জগতীয়

সত্য-মিথ্যার অতীত যে সত্য, তাহা মূলসত্য। মূল সত্য যে ধর্ম্ম, ইহার নাম স্বধর্ম্ম অর্থাৎ সত্য ধর্ম্ম। মনুষ্য মাত্রেরই উচিত এই ধর্ম্ম আশ্রয় করা। স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্বজাতি-ধর্ম্ম কাহাকে বলি? আত্মতত্ত্ব নিশ্চয় জানা, আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথা যাইব, ইত্যাদির নিশ্চয় হওয়া, ইহারই নাম স্বধর্ম্ম।

মনুষ্যমাত্রেরই এই ধর্ম্ম আবশ্যক। কি হিন্দু, কি যবন আর কি ম্লেচ্ছ, এ ধর্ম্মে সকল প্রকার মানুষ আছে। এই মতের নাম শুদ্ধমত, স্বমত, সত্যমত। অতএব এ মত সকলেরই দরকার। এ মত হিন্দুর মত, যবনের মত, নানা মতের সঙ্গে নহে। এ মতের নাম স্বমত, অর্থাৎ আমার আপন মত। স্বধর্ম্ম—আমার ধর্ম্ম, আমার পূর্ব্বাপরের ধর্ম্ম (নিত্য সত্যমত) আমার জন্মের পূর্ব্বের ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম কর্ত্তাভজন। আত্মতত্ত্ব তন্ত্রে উক্ত ষটচক্র ভেদ আছে বটে, সে অনুমান এক প্রকার সাধনের মত মাত্র, বর্ত্তমান নহে।

"সদাই ব্রহ্মজ্ঞানচিন্তা অনুমান।
ত্রাণ কভু নহে বিনা বর্ত্তমান॥"

অতএব এ মত যখন বর্ত্তমান মত, এ মত না জানিলে চৈতন্য কখনই হয় না। এই জগতে আসিয়া, স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া, যিনি যে মত যাজন করিয়াছেন, সে মত তাঁহার স্বধর্ম্ম কখনই নহে। পূর্ব্বাপরের ধর্ম্মও নহে; সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম্ম,—বিজাতীয় ধর্ম্ম,—গুরুত্যাগী ধর্ম্ম। তাহার বিশেষ কারণ বিবেচনা হইবে ভাবের গীতে।

"স্থূল ত্রিকুল উৎপত্তি,
এক মূল নিবৃত্তি গতি,"

সমস্ত জগতের উৎপত্তি স্থলও এক, নিবৃত্তি স্থলও এক, তাহাতে সন্দেহ কি? যখন মনুষ্যসকল মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হন, তখন তিমি কে এবং কি জাতি, তাহার কিছুই প্রমাণ নাই। প্রথমে তাঁহার নাম হইল, "খোকা", তাহার পরে ছয়মাসে অন্নপ্রাশনের কালে, জন্মকালের তীক্ষ্ণ সূত্র ধরিয়া, এই দেশের হিসাব সঙ্কেতে এক এক অক্ষর ধরিয়া 'র' 'ব' 'ক' ইত্যাদি এক একটি ধরিয়া নামকরণ হইল। অর্থাৎ 'র' আদ্যক্ষর হইলে নাম হইবে রামচন্দ্র। রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম একজন আছেন, কিম্বা ত্রেতাযুগে যিনি অবতার হইয়াছিলেন, বলা যায় না, কোন্ নামে ছেলের নাম রাখা গেল। বালক বাস্তবিকী সে রাম-চন্দ্র নহে, কেবল "কথার রামচন্দ্র!"—কাজের—নহে। যথার্থ রামচন্দ্র বলিয়া তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিবে না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মল্লা, কাজেল কেহই বিশ্বাস করে নাই। সকলেতেই জানেন, এ ব্যক্তি কে আমরা কেহই জানিনে, একটা সঙ্গেমাত্র রাখা গেল। ক্রমে সেই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত; বাহ্যজাতি উপাধির নাস্তিকতাতে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনি কে তাহা না জানিয়া, পরের কথায় ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া, প্রায় সকলেতেই ফিরিতেছেন। আপনি কে, তাহা না জানিয়া, লোক যে সকল সাধন ভজন করিতেছে, এ সমুদয়ই ভ্রম, ইহাতে সন্দেহ কি? তাহার বিশেষ বিবেচনা হইবেক, ভাবের গীতে।

"দেখ এই মুলুকে যত লোক কর্ত্তেছে সাধনা।
দেখে শুনে আমার বাসনা ত কখন হবে না॥"

যাহাকে সাধন ভজন করিয়া পাইতে হইবে, সে অসাধনে যাবে, তাহার সন্দেহ নাই। যেমন কোন মহৎব্যক্তিকে এক ক্ষুদ্রলোকে অনেক খোসামোদ করিয়া আপন বাটীতে আনিয়া, তাহার পর যদি সে মুখ বাঁকায়, তাহা হইলে সেই মহৎব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যায়, তেমনি সাধনের বস্তুও অসাধনে যায়।

"যারে টলিয়ে দিলে নাহি টলে, ভুল্‌লে ভোলে না।
বন্ধু বোলে বাঁধন দিলে খুল্‌লে খোলে না॥"

প্রমাণ—ভাবের গীত।

যাহাকে দূর করিলে চলিয়া যায় আবার তৎক্ষণাৎ আসে তাহাকেই আমরা ভজিয়া থাকি।

গুরু-প্রসঙ্গ।

দেশাচারের সাধন-ভজনের গুরু নিশ্চয়ই নাই। কে গুরু তাহা না জানিয়া, যাহাকে তাহাকে গুরু বলিয়া মানিতেছেন। দেখ প্রায় সকলেতেই গুরু শিষ্য একজনা পাওয়া যায় না। দেশাচারের যে সকল, কেবল ব্যবহারের গুরু; ইহারা অবিশ্বাসী! দেখ, সামান্য মন্ত্রপুত করিলে সেই ঘট সেই দেবতা হয়, এবং পুরোরিত, জিনি তাহাকে সংস্থাপন করেন, তিনি সেই ঘটকে প্রণাম করেন, এই জীবিতমান ঘটে আপন

ভজনীয় বস্তু সংস্থাপনপূর্ব্বক সেই দেবতার ঘট বোলে; শিষ্যকে বিশ্বাস করেন না, তাহার মাথায় অনায়াসে পা দেন। গুরু বড়, শিষ্য ছোট; বড়তে ছোটতে কখনও এক হইবে না। যে বড় তাহাকে আমরা ভজিনা, কেন না একসের পাত্রে সওয়াসের কখনও ধরেনা।

"আমার মতে যা যা আমাতে সাজে,
বেশী কম যা আমা হতে আসিবে কি কার্য্যে,
ক্রমাগত আমি যাতে নাই,
ভজিতে বা পূজিতে কিমতে পাই ?'

প্রমাণ "ভাবের গীত"।

গুরুতে শিষ্যতে দেশাচারের বিচারে চিরকালই ভেদ থাকিল।

আরও এক আশ্চর্য্য দেখ, গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে তোমার অধিকজপে অধিকার নাই, কারণ গ্রহণ ইত্যাদিতে খণ্ড পুরশ্চারণ, পরে মহা মহা পুরশ্চারণ করিলে তবে তোমার বহুজপে অধিকার হইবে, ও ক্রমে এই ভাবে অনেক জপ করিবে, তবে সিদ্ধ হইবে। তাহা হইলেই গুরুবাক্য অচৈতন্য; নগদ গুরু নাই। গুরুবাক্য এস্থলে অচৈতন্য জপের অপেক্ষায় থাকিল। গুরু, শিষ্য ও মন্ত্র এই তিনিই অচৈতন্য, তিন বস্তুই নিদ্রাগত,—কে কাহাকে এক্ষেত্রে জাগাইবে ?

গুরু যিনি, তিনি শিষ্যের ত্রিতাপ হরণ করেন; কিন্তু এখনকার ব্যবহারের অনেক গুরু। ইহারা শিষ্যের সন্তাপ

হরণ না করিয়া শিষ্যের বিত্ত হরণ করেন। তবেই কার্য্যা-কার্য্য রহিত যে গুরু, তিনি পরিত্যাগের গুরু, (এমন কথা হিন্দুশাস্ত্রে আছে), এবং সৎগুরু আশ্রয় করিবে। "সৎগুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে," এবিধান সর্ব্বমতে আছে। সৎগুরু অর্থে সাধু গুরু। সাধুগুরু সঙ্গ করিলে মনের সংশয় দূর হইতে পারে; নচেৎ দেশাচারে একটা প্রথাই আছে; যে গুরু সৎ অথচ গুরুর বেটা গুরু, তিনি উপযুক্ত হউন আর নাই হউন, তাহাতে কোন হানি নাই, অর্থাৎ তাঁহাকেই গ্রহণ করিবে। ভট্টাচার্য্যের বেটা হইলেই ভট্টাচার্য্য হয় না, বিদ্যা থাকিলেই ভট্টাচার্য্য হয়। তেমনি সৎসঙ্গ যাহার আছে তিনি সাধু গুরু। সেই সঙ্গ যাহাতে হয় তাহারই চেষ্টা করা বিবেচক মনুষ্যের উচিত। কতকগুলি মনুষ্য জ্ঞানী বলিয়া আপনা আপনি সৃষ্টিকর্ত্তা হওয়াতেই এক একটা নাস্তিকের দল উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই বলে যে, তাহারা মহা তত্ত্বজ্ঞানী; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে? তত্ত্বজ্ঞানী সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব শক্তিমান; সেই স্বভাব যুক্ত জ্ঞানী শুক শম্ভু প্রহ্লাদ ইত্যাদি মহাশয়গণ! শুক, মহামুনি ও প্রহ্লাদ মহাশয় পরম ভাগবত। ইহাদের চরিত্র বহু পুরাণে ব্যক্ত আছে। সে বিষয়ে অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। এখনকার তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা অচৈতন্য, মূর্খ, ও রিপুর গোলাম। কতকগুলি কামী ও লোভী কুখাদ্য ইত্যাদি ভক্ষণ করিবার লোভে কথাতে জ্ঞানী কবলাইয়া ফিরি-তেছেন। অন্য কেহ বলুক বা না বলুক, আপনা আপনি বলেন, "আমরা জ্ঞানী।" আর এই জন্যই এই নাস্তিকের দল খাড়া

হইয়াছে। এ কেমন, যেন ছেঁড়া চ্যাটায়ে শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা, বা বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়ান। হিংসক লোক সকলে জ্ঞানী বলিয়া বেড়ান। আসল তত্ত্বজ্ঞানীর স্বভাব অভেদ দর্শন,—পরস্পরে অভেদ—জগতের সহিত অভেদ। এখনকার তত্ত্বজ্ঞানীদের পরস্পরে কত ভেদ, অথচ বলে আমরা জ্ঞানী। মাত্র অচেতন মূর্খ কতকগুলা একত্রে মিলিয়া "আমি জ্ঞানী আমি জ্ঞানী" বলিয়া মিছা গোল উপস্থিত করিতেছে।

অবস্থা ও পাত্র।

প্রবর্ত্ত——সাধক——সিদ্ধি——নিবৃত্তি।

এই চারি অবস্থা।

সাধু——সতী——সুর——মহৎ।

এই চারি পাত্র।

প্রবর্ত্তসাধু—সাধকসতী—সিদ্ধিসুর—নিবৃত্তিমহৎ।

স্বদেশ ও বিদেশ।

স্বদেশ আর বিদেশ এই দুই দেশ। জগৎ বিদেশ ব্যবহার। জগৎ-অতীত স্বদেশ, পরমাত্ম। বিদেশের মতের সাধু আলাহিদা, আর স্বদেশের মতে সাধু আলাহিদা। বিদেশের অর্থ জগৎ, স্বদেশের অর্থ জগৎ-অতীত। বিদেশের মতে সাধু যাঁহারা, তাহারা ভেক ধারণ করিয়া যাত্রাওয়ালার মত সং সাজিয়া সাধু হন, সুতরাং লোকে যে কোন ক্রমে সাধু বলে এইমাত্র। গ্রন্থে ইংরাজি কথা শিখার ন্যায় সাধুকথা শিক্ষা করিয়া, বলিয়া থাকেন; কার্য্যে সাধু নহে। কিন্তু স্বদেশের মতে সাধু কাহাকে

বলে। যে ব্যক্তি অন্তর-বাহ্যে সাধু। গ্রন্থে প্রমাণ আছে, মহাজনেরা বলিয়াছেন,

"গঙ্গা পাপং শশিতাপং জন্য কল্পতরু হরে।
পাপং তাপং তথা জাল্যং সদ্য সাধু সমাগমে॥"

যাঁহার আগমনে পাপ তাপ জ্বালা তিন হরণ হয় তাঁহাকেই সাধু বলি। দেশ কাল পাত্র তিন প্রকার। দেশ দুইপ্রকার, স্বদেশ ও বিদেশ। কাল দুই প্রকার নিয়মিতকাল অর্থাৎ শুদ্ধাশুদ্ধ, আর কালাকাল নাস্তি অর্থাৎ সর্ব্বদাই শুদ্ধ। শুদ্ধ অশুদ্ধ বিদেশ। আর স্বদেশ শুদ্ধ নয়, অশুদ্ধ নয় সর্ব্বদাই শুদ্ধ। বৈষ্ণব দুইপ্রকার, যেমন গৃহস্থ বৈষ্ণব, আর উদাসীন বৈষ্ণব; তেমনি এই ভগবৎ ধর্ম্মের মতে, দুই প্রকার ভগবৎজন আছেন। যাঁহারা ভেক আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব হয়েন, তাঁহারা উদাসীন বৈষ্ণব। মহাপ্রভুর কৃপাবলোকনে মাগী একজাতি, আর মিন্‌সে একজাতি; উভয়ে একজাতি বৈষ্ণব হইয়া গেল। এ প্রকার বৈষ্ণব সত্য ত্রেতা, দ্বাপরে ছিল না। সংপ্রতি মহাপ্রভু জীব ও শিব, এই দুই পাত্র করিয়াছেন। গৃহস্থ বৈষ্ণব কেমন? "বিষ্ণু জানিত বৈষ্ণব," অর্থাৎ গৃহস্থমতে থাকিয়া, গোস্বামীর শিষ্য হইয়া বিষ্ণু-ধর্ম্ম জানিলে, বৈষ্ণব হয়। যেমন জনক, সনক, অম্বরিষ। ইহারা পোঁদে কৌপীন দিয়া বৈষ্ণব হন নাই, তেমনি এই ধর্ম্মেও অনেক ভদ্রলোক আছেন।

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিনটি অবস্থা। বর্ত্তমান অবস্থায় জীবন্ত স্বভাবের যে জাগ্রত, এ জাগ্রত স্বপ্ন। আসল যে জাগ্রত অবস্থা তাহাকে বলে চৈতন্য। যে স্বভাব জীব-স্বভাবের

অভাব, সেই স্বভাব-প্রাপ্তি জন্য সাধ্যসাধন। স্বপ্নাবস্থায় নানা দিক্‌দর্শন হয়, দুরদূরান্তর ভ্রমণ হয়, সেই স্বপ্নভঙ্গে জাগ্রত অবস্থাতে যেমন কোথাও যাই নাই, কোনও খান হইতে আসিও নাই, যেখানকার যেমন তেমনিই আছি; তদ্রূপ আপন আপন অবস্থা বিবেচনা করিলেই বোধ হইতে পারে, উপস্থিত বর্ত্তমান অবস্থার পূর্ব্বাপর নাস্তি; সুতরাং যাহার পূর্ব্বাপর নাস্তি, তাহার মধ্যে যেটা বর্ত্তমান হইতেছে, ইহাকেও নাস্তি মানিতে হইবেক। তাহার প্রমাণ পূর্ব্ব মহাজনেরা কহিয়াছেন, "রাজার রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট; দেখিতে দেখিতে কিছু নাই।" অর্থাৎ স্বপ্নেতে যাহা অস্তি দেখা যায়, স্বপ্নের ভঙ্গে তাহা নাস্তি হইয়া থাকে।

— —

সত্য-মিথ্যা।

সত্য-মিথ্যা কি প্রকার? অস্তি সত্য তথাচ নাস্তি, ইহার কারণ জন্ম মৃত্যু, উদয় অস্ত। সূর্য্য উদয় অস্ত প্রত্যহ হইতেছেন; কিন্তু এমনি কালের গতির কৌশল, নিয়মিত সময়ের মধ্যে প্রত্যহ বাল্য হইতে যুবা বৃদ্ধ পর্য্যন্ত হইতেছে। সূর্য্য নিত্য এক বয়সে আছে, তাহাতে বাল্য যুবা জরা নাই, অথচ বাল্য যুবা আছে; তেমনি আপন আপন দিকে অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে, মৃত্যু-ভয় সকলেরই হয়। অথচ অধিক দায় তাহার আত্মবুদ্ধির অগোচর, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই জীবের পশ্চাতে মৃত্যুভয় থাকে। যাঁহারা আপন দিকে তাকাইয়া দেখিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে, তৎকালীনের সে

বিষয়ের শেষ না করিয়া, যে সকল আনন্দে মতি হৃষ্টপুষ্ট, যাহা কিছু আনন্দের আয়োজন, সে সকলই বৃথা পশুর ন্যায়। ছাগ-মেষহননকারী ব্যক্তিরা যেমন সেই সকল পশুর পালনও করে, উদর পূরণের কারণে, প্রত্যহ দুই একটি করিয়া নষ্টও করে। আবার অবশিষ্ট পশুরা যেমন বোধশূন্য হইয়া বিহার করে, অদ্য পুত্রকন্যার সঙ্গে মরিতে হইবে, সেটা বোধ না করিয়া কামক্রীড়াদি করে, তেমনি যাহাদিগের মৃত্যুভয় হয় নাই, তাহারাও সেইমত পশু, তাহার সন্দেহ কি?

এমন দুর্ল্লভ মানব-দেহ ধারণ করত চিরজীবী হইবার উপায় চেষ্টা না করা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। এমন জন্মে শত ধিক! অতএব মনুষ্য মাত্রেরই উচিত যে, অগ্রে যেমতে বাঁচি; মৃত্যুভয় সংশয় শান্তি হয়, তাহার কোনও এক সুচেষ্টা করা।

"জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—তিন অবস্থা, আমারি তিন সময়ে হইয়া থাকে। আমার লয় নাই। আমি পৃথক একজন যেমন তেমনি থাকি। পৃথক পৃথক জীব ইহকালে পরকালে ঠিক থাকে, কেবল স্মরণ থাকে না; এইজন্য অনুমানের বাদী নিরুত্তর হয়। দুস্কর জন্ম-অন্ধকে চক্ষের অস্তিত্বে নিরুত্তর কিরূপে করা যায়।" এই সত্য ধর্ম্ম জানিলে, চক্ষুদান হইয়া চৈতন্য হয়,—পূর্ব্বাপর স্মরণ হইতে থাকে। ক্রমে সেই ব্যক্তি জানিতে পারে যে, এই চক্ষু এক পদার্থ, এবং সকলই সত্য বটে; আর এই স্বধর্ম্মের মর্ম্মযুক্ত হইয়া মৃত্যুজয় ইচ্ছামৃত্যুশীল, জীন্মুক্ত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই।

মানুষ ভজন।

একটি মাটীর ভাঁড়, কি হাঁড়ি দেখিলে যেমন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, নিশ্চয় কোন কুম্ভকারে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে তেম্‌নি দেহীর দেহ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ইহা কখনই আপনা-আপনি সৃষ্ট হয় নাই, অবশ্যই ইহার একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। ভাঁড় দেখিলে কুম্ভকার আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় বটে, কিন্তু সেই কুম্ভকার কোথায় বাস করে, তাহার নাম কি, যেমন জানিবার কোন উপায় নাই, তেমনি এই মানব-দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা কিরূপ পদার্থ, তাহার স্থির মীমাংসা করা একান্ত দুষ্কর এমন কি এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। কারণ তাহা মানববুদ্ধির অতীত ও কল্পনার বহির্ভূত; মানবের মন সহস্র চেষ্টা করিলেও কখনই এত উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞান, তীক্ষ্ণ প্রতিভা, বিচিত্র কল্পনা, কি উর্ব্বর মস্তিষ্ক এ সম্বন্ধে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কেননা প্রত্যক্ষ, দৃষ্টির বিষয়ীভূত, বাস্তব পদার্থ ভিন্ন কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়ে তন্ময় হইবার শক্তি মনের নাই। আমরা পাঁচ প্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেমন দর্শন করি, শ্রবণ করি, আস্বাদ গ্রহণ করি ও স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া থাকি, তেমনি মনের যে একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে, তৎ সহায়তায় মন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভোর হইয়া থাকে। এমন কি সময় সময়ে তাহাতে সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া পড়ে। কিন্তু

মনের এমন কোন ইন্দ্রিয় নাই যে, তাহার সহায়ে মন স্পষ্ট-ভাবে, কি নিশ্চিতরূপে এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে, কি এ ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়? কারণ যাহা কখন প্রত্যক্ষ করে নাই, তেমন সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয় কেবল মাত্র কল্পনার সাহায্যে স্থিরভাবে মীমাংসা করিবার, কি সেই ভাবে বিভোর হইবার শক্তি মনের আদৌ নাই।

রিপুবিশেষ উত্তেজিত হইলে, মন সেই ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে। কিন্তু যে রূপসীর রূপ প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহার মন কখনই সে ভাবে তন্ময় হয় না। যদি তিলোত্তমা প্রভৃতি প্রসিদ্ধাসুন্দরী, কি লোকমুখে পরিশ্রুত কোন রাজ-কন্যার রূপ অন্তরে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে মন কখনই তেমন উন্মত্ত কি বিভোর হইতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ব্যতীত মন কিছুতেই সে ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। কোন দরিদ্রকে কিছু দান করিলে মনে যেমন একটু বিমল আনন্দের উদয় হইয়া থাকে, মন তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু যদি কল্পনা করা যায় যে আমি অমুককে লক্ষ টাকা দান করিলাম, তাহা হইলে কি মনে সেই আনন্দের কণা-মাত্র লাভ হইয়া থাকে? যখন বাস্তব, চাক্ষুষ বস্তু ভিন্ন মন মজিতে পারে না, তখন চক্ষের অগোচর, বাক্যের অতীত, কল্পনার বহির্ভূত, সেই মালীকের প্রকৃত ভাব মন কিরূপে গ্রহণ করিবে? বা স্পষ্টভাবে সাধনার সুধাময় ফল অনুভব করিবে?

মনকে প্রবুদ্ধ, প্রাণকে শীতল, চিত্তকে বশ ও প্রবৃত্তিকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সাকার সাধনা ভিন্ন কোন উপায়ন্তর নাই। আগে পুণকে চৌকে মুখস্থ না করিলে, কেহ যেমন মহাজনী হিসাব ঠিক দিতে পারে না, তেমনি সাকার সাধনায় বিশেষরূপে অভ্যস্ত না হইলে, কাহারও নিরাকার সাধনায় অধিকার জন্মায় না। কারণ সেই ভাবময়ের প্রকৃত ভাব ধারণায় আনিবার ক্ষমতা মনের নাই। তবে রৌদ্র বাড়িলে যেমন সামান্য মলিন পাথরও চক্‌চক্ করে, তেমনি গুরুর কৃপা হইলে, একনিষ্ঠ হইয়া অভ্যাস করিলে, এই মানুষের দ্বারায় অনেক অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে।

এই মহাশয়, এ সংসারে সাকার দেবতা। একমাত্র চন্দ্রদেব আকাশে উদিত হন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ সরোবরে সেই এক চন্দ্রকে যেমন অভেদভাবে দেখা যায়, তেমনি মালীকের সত্ত্বা প্রত্যেক মানবের হৃদয়মন্দিরে বিরাজিত আছে। এই ভাবেতে বিভোর না থাকিলে, মনে এ ধারণা না জন্মিলে, বিশ্বাসের খেই দিয়া দৃঢ়রূপে অন্তরকে না বাঁধিলে, সংসারের সার ভাবিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্বদান না করিলে, তাঁহাকে প্রেম-ভক্তির আধার বলিয়া না ভাবিলে কি নিরাকারকে সাকাররূপে না আনিলে, মন কিছুতেই স্পষ্টরূপে সেই ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, ও মর্ত্তে থাকিয়া বিমল স্বর্গীয় সুখের আস্বাদন পায় না।

যেমন কায়া না থাকিলে ছায়া পড়ে না, তেমনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাকার সাধনায় সম্যক সিদ্ধিলাভ না করিলে, মালীকের

জ্যোতিতে হৃদয়কন্দর কিছুতেই আলোকিত হয় না। এই জন্য মানুষের ভিতর যে মানুষ আছে, স্থূলেরমধ্যে যে সূক্ষ্ম লুক্কায়িত আছে এই তত্ত্ব জগতে প্রচারিত হইয়াছে। কারণ ইহা ভিন্ন চঞ্চল মন কিছুতেই অচঞ্চলভাবে শান্ত থাকিতে পারে না, কি প্রত্যক্ষভাবে সাধনার সুধাময় ফল অনুভবে আনিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্য আমরা মানুষই ইষ্টনিষ্ট, এই সব তত্ত্ব সপ্রমাণ করিব এবং সৎযুক্তির সাহায্যে ভক্তহৃদয়ে এই মহাভাব অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইব। ঝিনুকের মধ্যে যেমন বহু মূল্য মুক্তা থাকে, তেমনি এই মানুষের হৃদয়ে যে মানুষ আছে, সংসারে যে সাকার দেবতা এই বিশ্বাস মনে বদ্ধমুল হইলে তবে প্রাণে ভাব আইসে? এই ভাব হইতে রস, রস হইতে প্রেম, ও প্রেম হইতে ভক্তি জন্মিয়া থাকে। অনেকে ভক্তি হইতে মুক্তি কল্পনা করিয়া থাকেন? কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের সাধক যাঁহারা মুক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কেবল প্রেমে বিভোর থাকিবার জন্য নিষ্কামভাবে, তাঁহারা সেই প্রেম-ময়ের প্রেমরসে প্রবৃত্ত থাকাই প্রশস্ত ও হিতকর বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন, মুক্তিলাভের জন্য লালায়িত হইয়া, সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, অন্তরে একটা কামনার ছায়া আসিয়া পড়ে। কাজেই ধন জন বিভব কিম্বা মান যশলাভের ন্যায় ইহাও একটা উদ্দেশ্যমুলক কামনাপূর্ণ সাধনা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে কিছুতেই নিষ্কাম সাধনা বলা যাইতে পারে না। কোন প্রকার কামনার বশীভুত না হইয়া, ফল লাভের আশা না করিয়া, আকাঙ্ক্ষাকে বিদায় দিয়া, কাঙ্গাল

ভাবে সেই প্রেমময়ের অগাধ প্রেমসাগরে ডুবিয়া থাকিবার যে কত সুখ, কিরূপ আনন্দ, তাহা নিষ্কামী সাধক ভিন্ন আর কাহারও অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই। অবোধ বালক যেমন একটি খেলনা হাতে পাইলে, খাবার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তেমনি যাঁহারা কোন একটি লোভের দাস হইয়া কোন কামনা পূর্ণ, কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাধন পথের পথিক হইয়া থাকে, তাঁহারা ভূতলে অতুল সেই স্বর্গীয় আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। স্বেচ্ছায় সাধকদের গন্তব্য সুপথে কণ্টক ছড়াইয়া থাকে। আশাত্যাগী হইলে অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে; এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত সাধকেরা নিষ্কাম ভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। গুরু পাদপদ্মে কামনা সকল অর্পণ করিতে পারিলে সহজে বৈরাগ্য লাভ করিতে পারা যায়, পাদপদ্মরূপ তরী আশ্রয় না করিেল, তুফাণপূর্ণ ভব সাগর পার হইবার আর উপায়ান্তর নাই। মেঘে যেমন পূর্ণিমার পূর্ণ-চন্দ্রের কান্তিকেও সম্যক আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, তেমনি কোনরূপ ভাল কি মন্দ কামনার ছায়া হৃদয়ে পড়িলে, সাধুর জ্যোতিতে অন্ধকারময় অন্তর আলোকিত হয়, আবার সেই বিমল জ্যোতিঃ নিতান্ত হীনপ্রভা হইয়া পড়ে। সেই জন্য কর্ত্তা-ভজন ধর্ম্মের ভক্তগণ মুক্তির প্রয়াসী নন, এমন কি উহাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেন না।

মুক্তিকেই নির্ব্বাণ কহে? যাঁহারা প্রকৃত প্রেমের আস্বাদন পাইয়াছে, সেই তত্ত্বজ্ঞানী প্রেমিক মাত্রেই মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভের জন্য আদৌ লালায়িত নহেন। কারণ স্নেহময়ী জননী ছেলেদের হাতে চুষী দিয়া যেমন দুগ্ধ খাওয়ায়, তেমনি

সত্যনামদাতা মহাশয় কর্ম্মকাণ্ডরূপ চুষী শিষ্যের হাতে দিয়া সত্যনামের আস্বাদন প্রদান করেন।

"অজ্ঞানং তিমিরাং ধ্বস্য জ্ঞানাঞ্জন সলাকয়া।
চক্ষু উন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

এই কথা বলিয়া মহাশয়কে প্রণাম করিতে হয়। কারণ তিনি সত্যজ্ঞানের কজ্জল চক্ষে পরাইয়া দিলে, তবে সেই পরম পুরুষের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে পারা যায়। তখন স্মরণ মনন নিরীক্ষণ করিবার ক্ষমতা জন্মায়।

কিরাকার ভাব ধারণা করিবার শক্তি যে মনের নাই, সে জন্য মহাশই যে সাকার দেবতা তাহা যথার্থ বর্ণিত হইল। এক্ষণে সাধন মার্গের দেহতত্ত্ব কিঞ্চৎ বর্ণনা করিব।

দেহতত্ত্ব কথনং।

জীবদেহে আত্মা কোন্ স্থানে আছেন এবং তাঁহাকে জানিবারই বা উপায় কি?

এই জন্য দেহে সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত দ্বীপ পৃথিবী সুমেরু গিরি অবস্থিতি করে এবং সমস্ত নদ নদ্যাদি, পর্ব্বত প্রভৃতি ও ক্ষেত্র ক্ষেত্রপাল সমুহের অবস্থিতি আছে, আর সকল মুনি ঋষি ও গ্রহনক্ষত্রগণ, পুণ্যতীর্থ,পুণ্যপীঠাদি এবং পীঠ দেবতাগণও সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। বিশেষতঃ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতেরও অবস্থান আছে অর্থাৎ। স্বর্গ, মর্ত্ত্য

পাতাল, এই জগতের মধ্যে যত জীব আছে, সে সকলই দেহ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে এবং ঐ সকল বস্তু মেরুদণ্ড বেষ্টন করত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত আছে। অধিকন্তু মানব দেহে শরীরাভ্যন্তরে সার্দ্ধত্রিকোটী নাড়ী আছে, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ী শ্রেষ্ঠা হয়। তাহাদিগের নাম যথা—ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, হস্তীজিহ্বা, কুহু, সরস্বতী, পুংসা, শঙ্খিনী, চিত্রানী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্ভুষা, বিশ্বোদরী, যশস্বিনী। ইহার মধ্যে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিন নাড়ী শ্রেষ্ঠতরা হয় এবং ঐ প্রধানা নাড়ীত্রয়ের মধ্যে একা সুষুম্না সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হয়েন, ঐ শ্রেষ্ঠতমা নাড়ী মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত মিলিতা আছে। যদ্রূপ বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যদেশে সুমেরু পর্ব্বতে ভূর্লোকাদি সপ্ত স্বর্গ আছে, তদ্রূপ নরদেহের মেরুদণ্ডে ঐ সুষুম্না নাড়ী আশ্রয় করিয়া, ছয় গ্রন্থিতে মূলাধারাদি আজ্ঞাখ্য পর্য্যন্ত পদ্মাকারে ছয় চক্র আছে। তাহার নাম যথা—মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাখ্য। সর্ব্বোপরি সহস্রার (যাহাকে সত্যলোক বলিয়া বর্ণনা করা যায়) ঐ সকল প্রধানা নাড়ী অধোমুখী বিষতন্তুসমা অর্থাৎ পদ্মসূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম হয় এবং ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না সাক্ষাৎ চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি স্বরূপা। ঐ নাড়ীত্রয়ের মধ্যগতা চিত্রানাম্নী অপূর্ব্বক গুণ-বিশিষ্টা এক নাড়ী আছে, তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা, তাহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলা যায় এবং সুষুম্নার মধ্যগতা ঐ চিত্রা নাড়ীকে যোগিগণ অমৃতানন্দকারক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ঐ সুষুম্নার বামভাগে ঈড়া চন্দ্রস্বরূপা ও দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা সূর্য্য স্বরূপা,

ঐ দুই নাড়ী ধনুকাকারে প্রতি চক্রে চক্রে বেষ্টন করিয়া, মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের নিম্নে ভ্রূসন্নিহিত নাসা বিবর পর্য্যন্ত গিয়া সুষুম্নাতে মিলিতা হইয়াছে, কেবল আজ্ঞাচক্র ব্যতীত বিশুদ্ধচক্র পর্য্যন্ত পঞ্চ পদ্মকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল নাড়ী মূলাধার হইতে উঠিয়াছে, তাহারা সকল শরীরের এক এক অঙ্গ পর্য্যন্ত গিয়া নিবৃত্ত হইয়া তত্তৎ স্থানীয় কার্য্য সম্পন্ন করে, অর্থাৎ চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহ্বা, সিস্ন, কুক্ষি, বক্ষঃ, হস্তাঙ্গুষ্ঠ, পদাঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বিরাজিতা হয়। ঐ সকল নাড়ীর শাখা প্রশাখা ক্রমে সার্দ্ধ ত্রিকোটী নাড়ী উতপ্রোত, অর্থাৎ বস্ত্রের টানা পড়িয়ানের ন্যায় সর্ব্ব শরীরকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ঐ সকল নাড়ী বায়ু সঞ্চার রহিতা, শুদ্ধ ভোগকে হরণ করেন। এ স্থলে নাড়ীর বিষয়ে আর বাহুল্য বর্ণন করা অনাবশ্যক, ষটচক্রের বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করি, শ্রবণ করিলেই, ইহার ভাবজ্ঞান জন্মিবেক।

ষটচক্র নিরূপণ।

মূলাধার চক্র বর্ণন।

গুহ্যদ্বারের উর্দ্ধে লিঙ্গমূলের অধঃ চতুরঙ্গুল বিস্তৃত যে স্থান আছে, তাহাকে মূলাধার পদ্ম বলা যায়, সেই পদ্ম, বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্তিমাকার এবং ব শ ষ স এই চারি বর্ণে চতুর্দ্দল বিশিষ্ট হয়, তৎকার্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডল

আছে, তন্মধ্যে বিদ্যুল্লতাকারা পরদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিতি করিতেছেন,তিনি সর্পাকৃতি সার্দ্ধ ত্রিসঙ্কচিত শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় বলয়াকার হইয়া সুষুন্না নাড়ীর দ্বার অবরোধ করিয়া আছেন, অর্থাৎ যে দ্বার দিয়া ব্রহ্মদ্বারে গমন করিতে হয়, কুণ্ডলিনী দেবী সুষুপ্তাবস্থায় সেই দ্বার স্বমুখে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। অতএব যোগিগণ প্রথমেই কুণ্ডলিনী চেতন করিবার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কুণ্ডলিনী শক্তি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়েন, যেহেতু কুণ্ডলিনী গুপ্ত বর্ণরূপা, সুতরাং মূলাধার উক্ত সুষুন্নারদ্বারে আঘাত করিলে, বর্ণ সকল অব্যক্ত নাদ হইতে বিকৃতরূপে বহির্গত হয়, যদ্রূপ বীণা যন্ত্রের তারের মধ্যে অব্যক্তরূপ স্বরের অবস্থান আছে, মুলে মেজরাপের আঘাত পাইলেই স্বর সকলের ব্যক্তরূপ অধিষ্ঠান হয়, তদ্রূপ কুণ্ডলিনী শক্তির প্রভাবেই বাক্যের উৎপত্তি হয়, সুতরাং তাঁহাকে বাগেদবী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং 'কুল' শব্দে যোনি হয়, তেঁহ যোনি সংস্থান বিধায় কুল-কুণ্ডলিনী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। অধিকন্তু তথায় কাজবীজ বিরাজমান, ঐ বীজ ক্রিয়া-শক্তি এবং জ্ঞানশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্ব শরীরস্থ প্রতি চক্রে ভ্রমণ করে। আর তত্র স্বয়ম্ভু নামে লিঙ্গ এবং ডাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী আছেন। গুরু উপদেশক্রমে বিধিমত কুম্ভক দ্বারা তাঁহাকে অর্থাৎ কুল-কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিলে অবিলম্বে সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বর হয়, অর্থাৎ খেচরত্ব, অমরত্ব, ত্রিকালজ্ঞত্ব প্রভৃতি সিদ্ধি হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১ ॥

স্বাধিষ্ঠান চক্র বর্ণন।

লিঙ্গমূলে যে দ্বিতীয় পদ্ম আছে, তাহার নাম স্বাধিষ্ঠান চক্র। ঐ পদ্ম রক্তবর্ণ, এবং 'ব ভ ম য র ল' এই ষড় বর্ণে ষড়দল বিশিষ্ট, তথায় বালাখ্য নামে সিদ্ধলিঙ্গ এবং রাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠান করেন। যে সাধক সর্ব্বদা ঐ সুসুন্দর স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ধ্যান করিতে সক্ষম হয়, তাহার নিকট কামরূপধারী দেবাঙ্গনাগণ কামে মোহিত হইয়া ভজনাভিলাষে ব্যগ্র হয়েন, এবং সেই সাধক মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ করত অশ্রুত, অজ্ঞাত শাস্ত্র সকলের অবাধে ব্যাখ্যা করিতে পারে, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হয়॥ ২॥

মণিপুর চক্র বর্ণন।

নাভিমূলে যে তৃতীয় পদ্ম আছে, তাহার নাম মণিপুর চক্র, ঐ পদ্ম স্বর্ণ বর্ণ এবং ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশ বর্ণে দশ দল বিশিষ্ট অতি সুশোভিত, তত্র রুদ্রাখ্য সিদ্ধ লিঙ্গ এবং লাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী হয়েন। ঐ মণিপুর চক্রকে বিধিবৎ ধ্যান করিতে পারিলে লোক সর্ব্ব সুখী এবং পাতাল সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকার মধ্যে যে স্থানে যে বস্তু আছে তাহা সকলি জ্ঞাত হইতে পারে এবং স্বর্ণাদি ধাতু উৎপত্তি করিতে পারে। ঐ পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে দ্বাদশ কলাযুক্ত সূর্য্যমণ্ডলরূপ জঠরাগ্নি আছে, ঐ জঠরানল বৃহত্তেজের অংশ, অর্থাৎ সাক্ষাৎ

মহাকাল স্বরূপ, যে হেতু তেঁহ জীবদেহে পাচকাগ্নিরূপে বাস করিয়া সমুদয় আহারীয় বস্তু পরিপাক করেন। অতএব সুবুদ্ধি যোগী সাধকেরা উপবাসাদি অনশনে বিরত হইয়া যথাকালে নিয়মানুসারে ঐ বৈশ্বানরকে অন্নাদি আহুতি প্রদান করেন, এবং তদকরণে প্রত্যবার আছে বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

অনাহত চক্র বর্ণন।

জীবের হৃদয়ে অতি সুশোভন যে চতুর্থ পদ্ম আছে, তাহার নাম অনাহত চক্র, সেই পদ্ম রক্তবর্ণ এবং ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশ বর্ণরূপ দ্বাদশ দলান্বিত হয়, তথায় পীনাক নামে সিদ্ধ লিঙ্গ এবং কাকিনী নামে শক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়েন। ঐ পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণাকার পীঠে (যম) ইত্যাকার বর্ণ শোভিত আছে, সেই যঙ্কারই বায়ু যন্ত্র, তাহাতেই প্রাণাখ্যা বায়ু নিয়ত অবস্থিতি করেন, সেই প্রাণ পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্ম ফলে বাধ্য, অর্থাৎ প্রাপ্তাভিমানী হওত নানা প্রকার বাসনাতে অলঙ্কৃত হইয়া জীবের হৃদয়ে বাস করেন, কার্য্যভেদে ঐ এক প্রাণবায়ু বিবিধ নাম ধারণ করেন, তত্তাবতের নাম উল্লেখ করা এ স্থলে বাহুল্য এ বিধায় সংক্ষেপে বলিতেছি প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ শরীরের অন্তঃস্থ হয়েন, অর্থাৎ হৃদয়ে প্রাণ, গুদে অর্থাৎ মূলাধারে অপান নাভিমণ্ডলে সমান, কণ্ঠদেশে উদান বাস করেন, এবং ব্যান বায়ু

সর্ব্ব শরীরে ভ্রমণ করেন। আর নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই পঞ্চ প্রাণ বহিঃস্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উদ্গার, হিক্কা, জৃম্ভণ এই পঞ্চ কর্ম্ম ঐ বহিঃস্থ পঞ্চ বায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু ঐ দশ প্রাণ যদিচ প্রধান, তথাপি প্রাণাদি অন্তঃস্থ পঞ্চ প্রাণ অতি প্রধান বলা যায়, তন্নিমিত্তই সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি ভোজনের পূর্ব্বে উক্ত অন্তঃস্থ পঞ্চ প্রাণকে অগ্রেই পঞ্চগ্রাস প্রদানের বিধি হইয়াছে। অতএব হৃদয়স্থ ঐ অনাহত চক্র ও তত্রস্থ পদার্থ সকল যে সাধক ধ্যান করিতে সক্ষম হয়, তাহার নিকটে কামার্ত্ত দেবাঙ্গনাগণও ক্ষুব্ধ হয়, অর্থাৎ সে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয়, এবং তাহার খেচরত্ব, ভুচরত্ব, অমরত্ব, ত্রিকালজ্ঞত প্রভৃতি সর্ব্বসিদ্ধি গুণ হয়॥ ৪॥

বিশুদ্ধ চক্র বর্ণন।

কণ্ঠমূলে যে পঙ্কজ পদ্ম আছে, তাহার নাম বিশুদ্ধচক্র, সেই পদ্ম ধুম্র-বর্ণ এবং অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণাত্মিকা ষোড়শ দল সমন্বিত হয়, তত্র ছগলাণ্ড নামে সিদ্ধ লিঙ্গ এবং শাকিনী নাম্নী শক্তি অধিদেবতার অবস্থান হয়। যে সাধক ঐ চক্র নিয়ত ধ্যান করে, সে সাক্ষাৎ বাগীশ্বর অর্থাৎ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং ভয়দ অর্থাৎ তাহার ক্রোধ হইলে ত্রিলোক কম্পমান হয়, বিশেষতঃ বজ্র সম দৃঢ় শরীর হইয়া চিরজীবি হয়॥ ৫॥

———

আজ্ঞা চক্র বর্ণন।

ভ্রু দ্বয় মধ্যে যে ষষ্ঠ পদ্ম আছে, তাহার নাম আজ্ঞাচক্র, সেই পদ্ম শুক্লবর্ণ এবং হ ক্ষ এই দুই বর্ণে দ্বিদলান্বিত হয়, তত্রস্থ অর্দ্ধনারীশ্বর সিদ্ধ লিঙ্গ এবং হাকিনী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ঐ পদ্মমধ্যে কর্ণিকারে শরচ্চন্দ্রের ন্যায় ঠং জ্যোতিঃলিঙ্গ সাধকগণের নিত্য ধেয়। তন্মধ্যে নবকোণ এক যন্ত্র আছে, সেই যন্ত্র মধ্যে চন্দ্রবীজ দেদীপ্যমান আছেন, সেই পরম তেজোময় পরম ব্রহ্ম শিবরূপী 'হংস' আকারে বিরাজমান হন, যাহার জ্ঞানে সাধকগণ পরমহংস নামে পরিচিত হয়েন, এবং পরম সিদ্ধি লাভ করেন। ঐ পদ্মমূলে ঈড়া, পিঙ্গলা উভয় নাড়ী স্বষুম্না নাড়ীতে মিলিতা হইয়াছেন। মন্ত্রান্তরে ঐ স্থান প্রয়াগ তীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যেহেতু ঈড়া পিঙ্গলা এবং স্বষম্নাকে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী বলিয়া বর্ণনা আছে, তন্নিমিত্ত ত্রিসংযোগ দ্বারা ত্রিবেণী বলা যায়! তদূর্দ্ধে ললাটস্থ পীঠত্রয় সপ্তম পদ্ম বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহা সর্ব্ব শাস্ত্রে গুহ্যতম, অর্থাৎ ষটচক্রের অতিরিক্ত সেই স্থানে নাদ, বিন্দু এবং চিৎশক্তি বিরাজিত হন। ঐ আজ্ঞা চক্রের মর্ম্মজ্ঞ সাধক সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর হয়, অর্থাৎ মুলাধারাদি বিশুদ্ধান্ত পঞ্চ চক্র ধ্যানের যে ফল, তাহা সম্যকরূপে ঐ আজ্ঞাচক্র ধ্যানেই হয়, বিশেষতঃ যে সাধক ঐ চক্রধ্যান করিয়া রসনাকে তালুমূলে নিবিষ্ট করত সহস্রারচ্যুত অমৃত পান করণে সক্ষম হয়, সে ব্যক্তি যক্ষঃ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সর আদি সর্ব্বলোকের পূজিত হয়, এবং তখন জপাদি

এবং প্রতিমাপূজা প্রভৃতি বাহ্য কর্ম্ম সকল তাহার ত্যেজ্য হয় অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনা করিয়া জ্ঞান জন্মে, আর মৃত্যু সময়ে যদি ঐ পদ্ম স্মরণ করত প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তবে সেই সাধক পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায় তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না॥ ৬॥

সহস্রার বর্ণন।

তালুমুলের ঊর্দ্ধদেশে দিব্যরূপ সহস্র দল পদ্ম আছে। ঐ পদ্ম অধোবক্ত্র, শুক্ল, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ এবং হরিদ্রাদি নানা বর্ণে সুশোভিত এবং তদ্দল সকল সর্ব্বশক্তি সমন্বিত, তাহার শোভা বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহেন, ঐ পদ্মের নিম্নভাগে হ স খ ফ্রেং হ স ক্ষ ম ল ব র যং এই দ্বাদশ বর্ণে দ্বাদশ দল এক অপূর্ব্ব পদ্ম ঊর্দ্ধমুখে আছে, তদুপরি অর্থাৎ উক্ত সহস্র দল পদ্মের কর্ণিকান্তর্গত গুরুরূপী পরমাত্মা শুদ্ধ পারদ ন্যায় এবং অগ্নিসম তেজঃপুঞ্জ ও কোটি সূর্য্য-সম-প্রভ, অথচ কোটি চন্দ্র তুল্য সুশীতল, নিত্য, নিরঞ্জন, নির্গুণ, নিষ্কাম দ্বৈতরহিত অর্থাৎ আদি অন্ত মধ্য শূন্য এই ত্রিশূন্য রহিত সাক্ষাৎ সহজ মানুষ তথায় নিত্য অবস্থান করিতেছেন। তিনিই সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্ব জীবের সহস্রারে আত্মারূপে বাস করিতেছেন, তাহারই সত্বা হেতু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চেষ্টার আবির্ভাব হয়, এবং তাঁহার নিঃসত্ত্বে নিত্য বস্তু যে, কোটিকল্প যুগযুগান্তরেও তাঁহার ধ্বংস নাই, তাঁহাকে অস্ত্রে ছেদন, বা অগ্নিতে দাহন, কিম্বা বায়ুতে শোষণ অথবা জলে কোমল করিতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহার বিনাশ

নাই। অতএব তাঁহার ঐ বাসস্থান অর্থাৎ উক্ত সহস্র দল পদ্মই জীবন মুক্তির আলয়। যে সাধক নিয়ত ঐ স্থানের ধ্যান করে তাঁহার এক বৎসর কালের মধ্যেই সকল সিদ্ধি লাভ হয়, এবং সেই সহস্র দল কমল হইতে ক্ষরিত সুধা যে সাধক পান করে, সেই সাধক স্বীয় মৃত্যুর মৃত্যু বিধান করত চিরজীবি হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি লোকে বিচরণ করিতে পারে, আর তদ্বারা কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির দেহ চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিও সেই পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়। সেই পদ্মকে জানিলে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরও চিত্ত বৃত্তির বিলয় হয়, অর্থাৎ সর্ব্বোদ্বেগ হইতে বিগত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়। ঐ সহস্র দল পদ্মের মাহাত্ম্য আমি কি বর্ণন করিব।

লয় কথনং।

প্রশ্ন। লয় শব্দের অর্থ কি? এবং তাহা কি প্রকার?

উত্তর। লয়ের অর্থ লীন হওয়া অর্থাৎ এক পদার্থে অন্য পদার্থ অকৃত্রিমরূপে মিলিত হওয়া, যাহা পুনরায় পৃথক হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহাকেই লয় বলা যায়। কিন্তু পুরাণ শাস্ত্রাদিতে ব্রহ্মাণ্ডের যে চতুর্ব্বিধ প্রলয় বর্ণনা আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জগতের প্রভু যখন শয়ন করেন, তাঁহার নিদ্রার নিমিত্ত যে প্রলয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। আর ঐ ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়,তখন জগতের প্রাকৃতিক প্রলয় হয়। এবং সাধকেরা জ্ঞান প্রভাবে পরমাত্মাতে যে লীন হয়, তাহার নাম আন্তরিক প্রলয়। আর সর্ব্বদা উৎপন্ন

প্রাণীদিগের দিবারাত্র যে নাশ হইতেছে, তাহাকে নিত্য প্রলয় বলে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল এই যে, প্রাণীদিগের দেহই ব্রহ্মাণ্ড, এবং প্রভু যে জীব তিনিই কর্ত্তা, ঐ জীবের নিদ্রাবস্থাই নৈমিত্তিক প্রলয় এবং তাহার আয়ুঃশেষ হইলে যে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি তাহার নাম প্রাকৃতিক প্রলয়, আর তন্মধ্যে জ্ঞানোদয়ান্তে যে সাধকের মৃত্যু হয়, তাহার পুনরাবৃত্তি সম্ভবে না, এজন্য তাহার মৃত্যুকে আত্যন্তিক প্রলয়, এবং অপরাপর প্রাণীর মরণকে নিত্য প্রলয় বলা হইয়াছে।

জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ।

প্রশ্ন। মহাশয়! জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি?

উত্তর। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ মূলাধারস্থিত সুষুম্নার মুখ, যাহাকে ব্রহ্মদ্বার বলা যায়, সেই দ্বারমুখাবরোধিনী যে কুণ্ডলিনী শক্তি, তাঁহাকে নাম সাধন দ্বারা চৈতন্য করত তাঁহার প্রসন্নতানুসারে সেই ব্রহ্ম পথ মুক্ত করিয়া, অন্তঃরস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে কুম্ভক দ্বারা সেই ব্রহ্মমার্গে গমনাগমন করণে সক্ষম হইলে, এবং হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলন করিতে পারিলেই পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়, অর্থাৎ সেই ভক্ত, সেই সাধক, সেই সর্ব্বলোক পূজিত, তাহার অগম্য স্থান এবং অসাধ্য কার্য্য ত্রিজগতে কিছুই থাকে না। সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা বেদান্ত শাস্ত্রের অবলম্বনে সাক্ষাৎ পরমাত্মার স্বরূপ জীবকে অবিনশ্বর জানিয়া মনকে নিরালয় করত নিস্নসংশয় হইয়া সেই মহাপুণ্য

চিন্তায় মগ্ন থাকে। এবং সম্পূর্ণ বিষয়ী হইলেও বিগতস্পৃহ হইয়া মনকে বৃত্তিহীন করত স্বয়ং পরিপূর্ণ আত্মবৎ জ্ঞান পাইয়া অহং আদি নাম ব্যবহার করে না, অর্থাৎ জগৎকে আত্মরূপ দেখে, যেহেতু তৎসম্বন্ধে এই জগৎ আত্মরূপে বিদ্যমান হয়েন। যে ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞান অবগত, সেই ব্যক্তিই আমি, তুমি বাক্য ত্যাগ করত অখণ্ডরূপ চিন্তা করে, তাহার অধ্যারোপ ও অপবাদ এতদুভয়ই বিলয় হইয়া যায়, সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযম করত সর্ব্বসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া নির্লিপ্ত বিষয়ে সুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করে আর সমস্ত ইতরালাপ বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া স্বয়ং সিদ্ধ হয়।

ইন্দ্রিয় দমনের উপায়।

প্রশ্ন। ইন্দ্রিয়দমনে মনের কি কর্ত্তৃত্ব আছে?

উত্তর। মনের ইচ্ছা ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না, এ বিধায় বাহ্যেন্দ্রিয় দমকের কর্ত্তাও মন। কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের পক্ষে মানসিক সাধনার সহিত কিঞ্চিৎ অভ্যাসযোগ অপেক্ষা করে, যেহেতু অভ্যাসেই তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার প্রমাণ এই যে, দুঃখীলোকে শৈশবাবস্থা হইতে প্রায় মৃত্তিকায় শয়ন ও শীতকালে সামান্য বসন পরিধান ও গ্রীষ্মকালে উত্তাপ সহ্য করে, এহেতু তাহারা অনায়াসে তাহা সহ্য করিয়া থাকে, ধনাঢ্য লোকে তদ্বিপরীত অভ্যাস জন্য ক্লেশ পায়, এবং শিশু দিগের যাদৃশ শীতোষ্ণতা সহ্য হয়, অধিক বয়স্ক লোক দিগের তাদৃশ হয় না, যেহেতু পিতা মাতার পালন ঘটিত অভ্যাসে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের ঐ অসহ্যতা হইয়া উঠে,

অতএব ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রবলতা অভ্যাসেই অধিক হয়, সুতরাং তাহার দমনে অভ্যাসাবলম্বন করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু উভয় অভ্যাসের প্রবর্ত্তক অথচ সুখ দুঃখের অনুবোধক মন।

কাম ক্রোধাদি রিপুকে পরাজয়ের উপায়।

প্রশ্ন। কাম ক্রোধাদি বৃত্তি মনের স্বভাবসিদ্ধমল অতএব তাহার নাশ কিরূপে সম্ভবে?

উত্তর। তাহার নাশ হওয়ার কথা আমি কহি নাই, ঐ সকল বৃত্তি স্বভাবতঃ মনে লীন অর্থাৎ অব্যক্তই থাকে, কেবল কারণবশতঃ কখনও কাহারও উদয় হয়, অতএব সাধনা দ্বারা তাহাদের উদ্দীপনের নিবারণ হইবার অসম্ভাবনা কি আছে? বিশেষতঃ অসৎ বৃত্তিচয়কে বশীভুত করিতে পারিলে, যদিও প্রারব্ধের বেগবশতঃ কখনো কাহারও উদয় হয়, তথাপি বিষ-দন্তহীন সর্পের ন্যায় তাহা অনিষ্টকর হয় না।

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সংসার ত্যাগ অনাবশ্যক।

প্রশ্ন। কিছু কিছু কাম ক্রোধাদি এবং বিষয়াসক্তি ব্যতীত, সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, অতএব ঈদৃশ উপদেশে এই উপলব্ধি করিতে হইবেক যে, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাস অপেক্ষা করে।

উত্তর। না, তাদৃশ কথার তাৎপর্য্য এমত নহে, বরং চিত্তশুদ্ধি গৃহে ব্যতীত, অরণ্যে পরিপক্করূপে হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তথায় চিত্তবিক্ষেপের বিষয় না থাকায়, তৎপরীক্ষার করণাভাব, এবং বিষয়াসক্ত জনের বনে নির্জ্জনে থাকার প্রবৃত্তি হইবারও বিষয় কি? গৃহস্থাশ্রমে সংসার সমুদ্রে বিষয়তরঙ্গে

মননৌকা নিরন্তর দোলায়মান থাকে, তাহাকে বৈরাগ্যাদি সাধন-রূপ কর্ণ অর্থাৎ হালি দ্বারা সুস্থির করত, সেই সকল তরঙ্গোত্তীর্ণ করিতে পারিলেই, তদীয় নিরাপদত্ব অবধারিত হইতে পারে। তুমি যে সাংসারিক লোকের কাম ক্রোধাদির প্রয়োজন থাকা বিবেচনা করিয়াছ, ইহা তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি, কেননা যদি আপন অধীন ব্যক্তি কোন অপরাধ করে, তবে তাহাকে মিষ্ট ভাষায় শাসন করিলে, সে কি শাসিত হয় না? বরঞ্চ সর্ব্বলোকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ক্রোধোদয়ে রক্তের উষ্ণতা জন্মে, তাহাতে ক্রোধবিশিষ্ট শাসনকরার শারীরিক অনিষ্ট সম্ভবে, এবং অসভ্যতা প্রকাশ পায়, মনের শান্তিভাবের অভাব জন্য ক্লেশ জন্মে, এতদ্ভিন্ন শাসিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে অধিক দুঃখ হইয়া স্নেহের খর্ব্বতা হইবার সম্ভাবনা, অতএব সাধুশাস্ত্রে এতদুপদেশ আছে যে যদি কোনও সময়ে অবস্থা-বিশেষে রাগদ্বেষাদি প্রকাশের নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তবে অন্তরে রাগাদির উদ্দীপন নিবারণ পূর্ব্বক ক্রোধাসক্ততার চিহ্ন মাত্র দর্শন করাইবেক। অপরঞ্চ, ইহাও সত্য বটে যে, কোন বিষয়ের বাসনা মনে না হইলে তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না, এবং বিনা উদ্যোগে সাংসারিক কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না, কিন্তু মনে বিকারশূন্য হইয়া শান্তভাবে সাংসারিক তাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, লোকযাত্রা নির্ব্বাহের কোন ব্যাঘাত নাই। এ স্থলে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার করার অর্থাৎ কর্দ্দমস্থ বাইন মৎস্য এবং সলিলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকার সম্ভব কি?

সর্ব্বাপেক্ষা ক্রোধই প্রধান রিপুঃ

ক্রোধস্তু সর্ব্বনাশায় জ্ঞাননাশায় জ্ঞানিনাং।
ধনিনাং ধননাশায় ধর্ম্মনাশায় ধর্ম্মিনাং॥
তস্য ত্যাগকরো যস্তু স কৃতী স তু ধর্ম্মবিৎ।
জিতং তেন জিতং তেন জিতং তেন জগত্রয়ং॥
তমঃশত্রুর্জিতো যেন তেন জ্ঞানং করে কৃতং।
তমসাচ্ছাদিতং জ্ঞানং দুর্লভং পাপচেতসাং॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত বেদমার্গনিসেবনাৎ।
ধর্ম্মমাসাদ্য যত্নেন তেন হন্যাত্তুতং রিপুং॥
ধর্ম্মাদুৎপদ্যতে জ্ঞানং পাপাদ্যুৎপদ্যতে তমঃ।
তমসা লুপ্যতে জ্ঞানং মেঘেনৈব যথা শশী॥
ততো লভেদহঙ্কারং অহঙ্কারাৎ পতিষ্যতি।

ক্রোধ দ্বারা মনুষ্যের সর্ব্বনাশ হয়, অর্থাৎ জ্ঞানীর জ্ঞান, ধনীর ধন, এবং ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম নষ্ট হয়, ক্রোধকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, সে ব্যক্তি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিজগতে জয়ী হইতে পারে, আর তমঃ অর্থাৎ ক্রোধ বিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্ত পাপাবৃত হয়, এ নিমিত্ত তাহার জ্ঞান কদাচ বিশুদ্ধ হইতে পারে না, অতএব সেই তমোরূপ শত্রুকে জয় করিতে পারিলে জ্ঞান তাহার হস্তগত হয়, বিশেষতঃ শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মাদি তাবতের প্রতিবন্ধক যে তমোরিপু, তাহা বিনাশ করা অতিকর্ত্তব্য। অধিকন্তু ধর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি

হয় এবং পাপ হইতে তমঃ অর্থাৎ ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ঐ তমঃ দ্বারা জ্ঞান লোপ হয়, যদ্রূপ মেঘ দ্বারা পুর্ণচন্দ্রের কিরণ লোপ হইয়া থাকে তদ্রূপ সেই তমঃ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়া তৎকর্ত্তৃক লোকের পতন হয় ইহা নিশ্চয় জানিবে, এতাবৎ কারণে ক্রোধ অবশ্য পরিহার্য্য।

দেহতত্ত্ব সম্পূর্ণ।

ট্যাকশালী বোল।

এই আইন কেবল কাঙ্গালদিগের জন্য। যাহারা দেল ফকিরির করনী করিবেক, শুদ্ধ তাহাদিগের জন্যই এই বিধান, ইহা শ্রীমুখের আজ্ঞা।

১। শব্দগুরু শব্দচেলা, শব্দে শব্দে হয় উজ্জলা, যে স্থানে শব্দের বাস, আপি কর্ত্তা আপি দাস। ঐ শব্দের স্বরূপ রূপ সামনে রাখিয়া আপনাকে অন্তিমকাল জ্ঞান করিবেক। সাধু বাক্য কায়মনে স্মরণ মনন নিরীক্ষণ করিবেক যাহার তাৎপর্য্য ডাকা, তোমার দেহে তুমি আপনি বৈসহ। ইহা হইলেই ধোকা মিটে ও তবেই আগে পিছে সত্য হয়।

২। মানুষের নাম তামাসা, কর্ম্মের নাম সহজ, দর্শন করা. চিত্র বিচিত্র।

৩। ঘুঁটে কুড়ান দশা স্মরণ থাকা চাই, তাহা হইলে প্রশ্রয় পাগল হওয়া হয় না।

৪। সত্যবাদী হইতে সত্য পরমার্থ কঠিন।

৫। সত্য আচার বিচার দুর্ল্লভ, ঐ আচার স্বাব্যস্ত না হইলে তাকাতাকি হয় না।

৬। বাপ মার ঘরে জন্ম না হইলে, আচারে খাড়া হওয়া হয় না।

৭। বৃহৎ বটবৃক্ষের ফল অনেক ছোট ছোট হয়, কিন্তু বিবেচনাতে ঐ ফলের মধ্যে ছোট ছোট বীজ রহে, তাহাকেও বৃহৎ বটবৃক্ষ জানিতে হইবেক।

৮। আপন বাক্য সত্য না হইলে, সত্য স্বাব্যস্ত হয় না।

৯। *আসকের চক্ষে মানুষকে না দেখিলে, দেখা মঞ্জুর হয় না।

১০। শ্রবণ জানা দর্শন এতেক বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলে, বিচ্ছেদ রহে না, কখন বুড়ির কোলে ছেলে, আর কখন বা ছেলের কোলে বুড়ী।

১১। মহাজনের নিকট আপনাপন সত্ত্ব অভিলাষ ত্যাগ করতঃ আচরণে খাড়া হইলে, একাঙ্গ ভক্তি প্রাপ্ত হয়! পরে ঐ একাঙ্গ ভক্তি সাব্যস্ত হইলে, স্ব অঙ্গী হয়, উভয়ে স্ব অঙ্গী হইলেই দর্শন পরশন হইয়া থাকে।

১২। অসুসারে সুসার করহ, তাঁহাকে ডাকিলেই উত্তর পাইবে, পরের মুখে ঝাল খাইতে হয় না।

১৩। কারিকরের জুতার ঘা দগদগে থাকিলে, দরদ আহা প্রাপ্তি বর্ত্তমান হয়, এবং ঐ স্থান হইতে নগদ সওদার কারবার হয়।

* অনুরাগের সহিত।

১৪। একবার হরিনাম করিলেই হয়, ও সুরে হইলেই হয়, কিন্তু প্রেম-তরঙ্গে মাতা না হয়!

১৫। সব দিকে তাকিয়ে চলা হয়, তাহারি নাম মানুষ রাখে মান থাকে হুস।

১৬। মুখে মুখে খাওয়া বুঝে পাওয়া, ইহার তাৎপর্য্য একরূপ, একাধার, আচার বর্ত্ত।

১৭। যে ব্রজের চাতক হবে, গরল রেখে সুধাপান করিবে।

১৮। অক্ষর, নাম অর্থ ও ভাব, তাবত অক্ষরে আছে, ঐ অক্ষর ঐক্য হইলে, আর অসুসার থাকেনা।

১৯! প্রতিকায় শান্ত চিত্ত হওয়া চাই?

২০। সর্ব্বদা হর্ষ চিত্ত হওয়া চাই?

২১। নির্ম্মল রস সর্ব্বত্রে আছে, প্রকাশ অনুরাগ ব্যতি-রেকে আলাপ হয় না।

২২। হেতু সম্বন্ধে গঙ্গাস্নান অপেক্ষা বারুয়ের পানা পুকুরে স্নান করা উত্তম।

২৩। প্রতিবাসীর সহিত প্রীতি করা ভাল, কারণ তাহারা বাপ মায়ের দেশের মানুষ, তাহাদিগের সঙ্গেই স্বধর্ম্ম করা বিধেয়।

২৪। ভক্ত পরিবারের নিকাষ নাই, কর্ত্তা হইতে গেলেই জবাব দিতে হইবেক।

২৫। কোদাল পাড়িয়া যে ধন উপার্জ্জন হয়, সে ধনের মার নাই, তাহা অটুট।

২৬। যে ঘরে রস অনাবৃত, তাহার রসিক হইবার সাধ হয় না।

২৭। পিতৃ আজ্ঞা পালন করিলেই, পিতৃধনের অধিকারি হওয়া যায়।

২৮। ঠাকুর পুত্র ঠাকুর হন, গোঁসাই পুত্র গোঁসাই হন না, কারণ গোঁসাই ধর্ম্মযাজন না করিলে!

২৯। কেদে পেট না ভরাইলে পেট ভরা হয় না।

৩০। আপনাকে না বুঝিতে পারিলে—হরিগুণ গানের বিচার বুঝা যায় না।

৩১। মানুষের রং কালো ধোলোর মধ্যে নয়?

৩২। জ্যান্তে মরিলে, আর মরিতে হয় না?

৩৩। পবিত্রের স্থানে ছড়াহাড়ির দরকার করে?

৩৪। কোলে যায়গা দিয়ে খেতে স্থতে হইবেক? সেবার কর্ম্ম হওয়া চাহি।

৩৫। নিচুধর্ম্ম বুঝিয়া স্থঝিয়া লইতে হইবেক।

৩৬। নির্জ্জন স্থানেই বাসা করা ভাল।

৩৭। সর্ব্বদা কাতর যুক্ত হওয়া চাহি।

৩৮। মুখ থাকিতে নাকে গোঁজা না হয়।

৩৯। আসল ছাড়িয়া নকল ভজা না হয়।

৪০। সব শিয়ালের এক বোল।

৪১। হোর্ণে শিয়ালের কামড় না সহিলে ডাক ডাকেনা।

৪২। রাস্তার তল্লাস সাধু সঙ্গ ব্যতিরেকে পাওয়া যায় না।

৪৩। মানুষের দরজায় গোলামী সাব্যস্ত হইলে, আচারে সাব্যস্ত হওয়া যায়।

৪৪। অহঙ্কার না করিলেই স্রোতের যোগ রহে, তাহারই নাম দরিয়া বাজীর খেলা।

৪৫। মানুষের নিকট আশ্রয় নিশ্চিত হইলে, কোন মতেই কোন বিষয়ে সংশয় হয় না!

৪৬। সুর সাব্যস্ত হইলে আচার সাব্যস্ত হয়, ঐ আচার যার সাব্যস্ত, সেই ব্যক্তি সদাচারী, তার কি আচার আর কি কারবার সকলই সত্য।

৪৭। সাধু আজ্ঞায় বিশ্বাস হইলে কোন অসুসার রহে না।

৪৮। সহ্য অবলম্বন বিনা কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া হয়না।

৪৯। এক আঙ্গুল বাকী থাকিতে নদী পার হওয়া মঞ্জুর নহে। কিনারা লওয়া চাহি, তাহাতে কে যানে ডিঙ্গে কে জানে ডোঙ্গা।

৫০। ঘরের জঞ্জালে যত্ন করিলে, ছাই গাদা সার গাদা হইয়া থাকে, ঐ সার ব্যতিরেকে শস্য হয় না।

৫১। অনর্থক কালক্ষেপন করা না হয়, সব দিকে তাকিয়ে চলা চাহি।

৫২। বাদসাহের তক্তে বাঁদীকে স্থান দিলে বাঁদীর পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ রাখা চাহি।

৫৩। সদর মফঃস্বল একরূপ জ্ঞান না হইলে, ঐহিক পরমার্থিক সত্য হয় না, এবং সেই ব্যক্তিকে হুজুর বলা যায় না।

৫৪। পদের প্রত্যাসা ত্যাগ না করিলে পরমার্থ চিন্তা হয় না।

৫৫। সিংহাসন সঙ্গে লইয়াও পরমার্থ হয় না।

৫৬। জগদীয় ধোকার ভাজন হইতে মুক্ত হইলে, তবে আপনাকে জানা যায় ও বিশ্বাসঘাতকতার পাপ হইতে মুক্ত হয়।

৫৭। ভিন্ন ভাব হইতে মুক্ত হইলেই দরদ সাব্যস্ত হয়, সংসার ত্যাগ করিতে হয় না, কেবল কু-মত বিকার ত্যাগ করিবে এই সকল সহজ, কিন্তু ত্যাগ না করিলে সহজ হওয়া হয় না।

৫৮। সর্ব্বজীবের উপরে ভক্তি করিবে, তবে রং ধরিবে, ঐ রঙ্গের চিহ্ন কেবল কঙ্গাল মাত্র।

৫৯। যে কুড়েতে আলো আছে, তাহার তুল্য স্থান স্বর্গাদি নহে।

৬০। ধন্নবাদ বিরহিণীকেই দেওয়া যায়, যেহেতু বিরহিণীর হুঙ্কারেই বর্ত্তমান হইয়া থাকে, বিরহিণী না হইলে দরদী হয় না, দরদীর স্থানেই স্মরণ মনন ও নিরীক্ষণ জানিবে।

৬১। স্বামীর স্ত্রী সকলেই, এবং স্বামীর নাম সকলেই জানে, কিন্তু সম্ভোগ না হইলে প্রীত কথনি মাত্র।

৬২। দেশের শাক অন্ন ভাল, তাহাতে তার পাওয়া যায়।

৬৩। যেখানে ঘা—সেইখানেই আহা এবং তৃপ্তি।

৬৪। মুখামুখী খাওয়া, নাম ধর্ম্ম ইত্যাদি, তার না পাইলে তৃপ্তি হয় না।

৬৫। যেহেতু কাকেও মুখামুখী করে খায়, এবং গঙ্গায় কুম্ভীর আছে, বিড়াল তুলসীবনের কেঁদো বাঘ মাত্র।

৬৬। যেস্থানে হরিমন্দির শ্বেতখানাও সেই বাড়ীর মধ্য-স্থলে, ডাক হরিমন্দির বলে, গৃহস্থ যে, সে ঐ শ্বেতখানায় সেচ্ছা-পূর্ব্বক অকৈথবে সন্ধ্যা দেখায়।

৬৭। বেশ কৃমত তলোয়ার দশ কড়ার খাপে থাকে, তাহাতেই সে অমূল্য হয়, কিন্তু খাপে না থাকিলে, তাহাকে খাপ ছাড়া বলে, এবং দামে খাড়া হয়।

৬৮। গুপ্ত যে, মুক্ত সে, বেপরদা ব্যাভিচারিণী।

৬৯। যাহার বিষয় কিছু নাই, তাহার সকল বিষয়ই আছে।

৭০। পূর্ব্বাপর বিচার করিবে, চারিযুগের লয় আছে, সত্য প্রসঙ্গের লয় নাই।

৭১। আদরে থাকা, অবলা হওয়া ও হরিমালা লওয়া, ইহা স্বীকার করিলে, যাজনের রাস্তা পাওয়া যায়।

৭২। বিষ্ঠার পোকায় যাহার জন্ম, বিষ্ঠাতে তাহাকে স্বর্গে রাখিলেও থাকে না।

৭৩। রশুইখানায় থাকিলে কি হইবে? ঐ স্থানের ঘ্রাণ লইয়া চলিতে হইবে।

৭৪। মম গুরু তো জগৎ গুরু?

৭৫। যদি বাক্য প্রাপ্ত হয় মহৎ আদেশে, থাকে বা না থাকে বস্তু অন্য সহবাসে।

৭৬। গঙ্গাজলের কলসে অন্য জল মিশাইলে অনিষ্ট হয়, অতএব পাত্রকে সাবধান চাহি।

৭৭। আদবের টুপী মাথায় থাকিলে, সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারা যায়।

৭৮। কেবল টাকা দিয়ে, ঘেসে থাকলে, কোলাকুলিতে হুজুরী হয় না।

৭৯। যেখানে ডাকিলে আওয়াজ পাওয়া যাইবে, সেই আপনার পরিত্রাণের স্থান জানিবে।

ধর্ম্মের উপর নিয়ম—যাহা বারণ আছে।

(১) সত্য বলা সঙ্গে চলা। (২) মিথ্যা বলিবে না। (৩) পরদারি করিবে না। (৪) হিংসা করিবে না। (৫) বধ করা না হয। (৬) চুরি করিও না। (৭) উৎচ্ছিষ্ট খাইবে না। (৮) মাংস ভক্ষণ নিসিদ্ধ। (৯) মদ্যপান নিসিদ্ধ। (১০) বৈঠকে বসিয়া তামাক খাওয়া না হয়।

. এই যে টেকশালী বোল, ইহা বাজারেব জন্য নহে, অথবা দাইকের জন্য নহে, কেবল কাঙ্গালের জন্য। ইহা শ্রীমুখের আজ্ঞা কাঙ্গাল আমার আমি কাঙ্গালেব প্রাণ।

সত্য হি কেবলম্।

উপাসনা।

শুক্রবারের সায়ংকালে নিয়মিত অনুসারে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধিবে। ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রতার সহিত মনকে একাধারে রাখিয়া—আসনোপরে ফুল, চন্দন মিষ্টান্ন দিয়া আহ্বান পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে, "প্রভু" একায়ীকের গাফিলি তক্সির মাপ করহ। দোহাই তোমার—এই বাক্য তিনবার কহিবে। "জয় কর্ত্তা" এ দেহের কসুর সকল মাপ করহ, উত্তর মুখে নাম স্মরণ কবিবে।

স্মরণ।

জয় গুরু সত্য ! জয় গুরু সত্য।

তুমি সত্য নিত্য তব সুখ নিত্য সত্য।

তথ্য সত্য তব বাক্য যা কর তা সত্য ॥

বিশেষণ তব সুখে চলি বলি যেন।

তোমা ভিন্ন তিলার্দ্ধ নহি যেন কখন ॥

তব সঙ্গে সঙ্গী আছি থাকিত সদাই।

তুমি তুমি আমি তুমি যা খাওয়াও তাই খাই ॥

সত্য নাম রূপ স্মরণ পূর্ব্বক ভূমিতে প্রাণিপাত করিবে।

শুক্রবারে স্ত্রী সম্ভোগ নিষেধ। মন না টলে (অটল ভাবে) বিশুদ্ধচিত্তে মনের মানুষের ভজনা করিবে। বাহ্যিক কার্য্য নিষিদ্ধ, অন্য অভিলাষ শূন্য হইয়া ভয়, ভক্তি বিশ্বাস করিবে, সত্য জ্ঞানে মহাশয়ের বাক্য বিশ্বাস থাকিলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

মহাশয়ের লক্ষণ কি ?

প্রশ্ন। মহাশয় কে ?

উত্তর। শিক্ষাগুরু বা সাধুগুরু।

প্রশ্ন। মহাশয়ের লক্ষণ কি ?

উত্তর। ম—মরা, হ—হাবা, স—সহ্য, অ—অবলা এই চারি ভাব যুক্ত যে ব্যক্তি—তিনিই ম হা শ য়—পদ্মবাচ্য হন্। তাঁহার কোন আশয় নাহি,—তিনি নির্লোভী, নিষ্কামী,

নিরহংকার, রাগ দ্বেষ ও হিংসা রহিত। সত্ত্বগুণ [illegible], সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় এবং নির্ব্বিকারী ও শুদ্ধাচারী সাধু সদানন্দময় চিত্ত তিনিই মহাশয়।

বরাতি।

প্রশ্ন। বরাতি কাহাকে বলে ?

উত্তর। শিষ্যকে ?

প্রশ্ন। বরাতির লক্ষণ কি ?

উত্তর। দাস্যভাব, আজ্ঞাসেবা পালন, গোলামী। সাব্যস্ত—যা বলা তাই করা। সেই মনের মানুষের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইলেই তাঁহার সহিত অভেদ অর্থাৎ একাত্মা হওয়া বরাতির লক্ষণ।

মহাশয়কে সামান্য মানুষ জ্ঞান করিবে না, তিনি পূর্ণচাঁদ সত্য মানুষ। নিষ্ঠা ভাবাশ্রিত হইয়া দৃঢ় ভক্তির সহিত সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে স্মরণ, মনন ও নিরীক্ষণ করিবে। ইহাই বরাতির লক্ষণ। মহাশয়ের নিকট কদাচ মিথ্যাকথা কহিবে না, কোনও কপট ব্যবহার করিবে না, চাতুরী শূন্য হইয়া তার ভাবে বিভোর থাকিবে। ভয়, ভক্তি বিশ্বাস করিবে,—ইহাই বরাতির লক্ষণ।

অতঃপর সাধুগণ স্থানে নিবেদন।
সহজতত্ত্ব নূতন ভাবেতে স্থাপন ॥
হয়ে থাকে ত্রুটি কিছু করুন মার্জ্জনা।
ভগবৎ স্থানে মম এই সে প্রার্থনা ॥
ভক্তি ভাবেতে বন্দি গুরুর চরণ।
জয় জয় জয় প্রভু সত্যনারায়ণ ॥

ইতি—